ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১১ সংখ্যা ।। ১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৭ নভেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

পুলিশ লেলিয়ে গোটা রাজ্যকেই নন্দীগ্রাম বানাতে চান মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন সিপিএম সরকার গোটা রাজ্যকেই নন্দীগ্রাম বানাতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ৩০ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে যেখানেই মানুষ সংগঠিত হচ্ছে সিপিএম সরকার সেখানেই পুলিশ ও

ক্যাডার লেলিয়ে প্রতিবাদী জনগণকে ঠাণ্ডা করার লাইন নিচ্ছে। ২০০৭ সলে ১১ মাস ধরে নন্দীগ্রামে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী ও পুলিশ যে অত্যাচার চালিয়েছে তা রাজ্যবাসী জানেন। সম্প্রতি নন্দীগ্রাম থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে জঙ্গলমহলের লালগড়েও একই কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপর মাইন হামলার বদলা নিতে পুলিশ লালগড় এলাকার স্কুলছাত্র, অবসর প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক সবাইকে ধরপাকড় করতে শুরু করেছে। আদিবাসী জনজাতি

(এরপর ২ পাতায়)

হিন্দু সংগঠনগুলির ভাবমূর্তি নষ্ট করছে এক শ্রেণীর সংবাদ মাধ্যম

গূঢ়পুরুষ ।। দেশের বৃহৎ শিল্পপতি গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি এখন সচেতনভাবেই নাশকতামূলক বিস্ফোরণের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভারতবন্ধু হিন্দু সংগঠনগুলিকে জড়িয়ে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, হিন্দু সংগঠনগুলির ভাবমূর্তি নষ্ট করে, তাদের ইসলামি জেহাদিদের সমগোত্র করা। এতে মুসলিম সমর্থন পাওয়া যাবে। ভারতের বৃহৎ ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার চায়। তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ঝুলিতে মুসলিম ভোট ভরতে টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান টাইমসের মতো সর্বভারতীয় ইংরাজি খবরের কাগজের পরিচালকরা দিবানিশি খাটছে। অসত্য বা অর্ধসত্য তথ্য প্রচার করে পাঠকদের বিভ্রান্ত করার পাকা ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণ হিসাবে গত শুক্রবার (নভেম্বর ৭) টাইমস অব ইন্ডিয়ার কলকাতা এডিশনের প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রধান সংবাদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই প্রধান খবরটিতে কোনও রাখঢাক না রেখে একেবারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শ্রীকান্ত প্রসাদ পুরোহিত গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুম্বাইয়ের গোয়েন্দা পুলিশের কাছে দেওয়া জবানবন্দিতে স্বীকার করেছেন যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা তিনি। ইসলামি জেহাদিদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা "অভিনব ভারত" নামে একটি গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনেরই স্বেচ্ছাসেবকরা মালেগাঁওতে গত ২৯ সেপ্টেম্বর বিস্ফোরণ ঘটায়। এই

Lt-Col sings, admits he was Malegaon mastermind

Mateen Hafeez | TNN

Mumbai: Lieutenant Colonel Purohit, the first serving officer of the Indian Army to be arrested in connection with a terror bomb attack, has confessed to being the mastermind of the Malegaon blast. The 37-year-old officer reportedly told police he had mapped the conspiracy and provided the explosive for the September 29 're-venge' attack that killed six people.

It is learnt that Purohit, who was arrested on November 5, admitted to supplying RDX and weapons to members of the Abhinav Bharat, a radical Hindu outfit. Sources said Mumbai's Anti-Terrorism Squad was planning to question another serving army officer in this connection whose name cropped up during Purohit's interrogation. However, the confessional statement is not admissible in court.

Sources said Purohit was conclusively cornered after he was confronted with telephone records that showed his links with another ac-

OFFICER & A TERRORIST?

- Lt Col Shrikant Purohit, 37, was arrested by the Mumbai ATS on Nov 4 on charges of murder and terror conspiracy in the Malegaon blast case
- Purohit has subsequently confessed that he was the mastermind of the plot and also provided the RDX to carry out the explosion that killed 6 and wounded 89 in the textile town on Sept 29, 2008
- Purohit is also co-founder of Abhinav Bharat, a right-wing Hindu outfit
- An accomplished athlete, Purohit had joined NCC and studied in Pune. Between 2000 and Jan '05, he was posted in J&K
- Purohit had been promoted as Lt Colonel in April this year

'Army's prestige hurt'

New Delhi: The army admits its reputation has been tarnished by Lt-Colonel Shrikant Prasad Purohit's arrest. "The army's prestige has been hurt after the officer's name came up in the Malegaon blasts case," army deputy chief (planning and systems) Lt-General S P S Dhillon said on Thursday. P 6

cused, retired Major Ramesh Upadhyay. "I am the mastermind of the blast. I arranged for the RDX and weapons but I can't understand how the weapons reached Abhinav Bharat members," a source quoted Purohit as telling the police. While no anti-terrorism squad (ATS) officer was willing to comment on the reported confession, ATS spokesperson Dinesh Agrawala said, "It's not correct."

► Perfect record, P 6

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৭ নভেম্বর ২০০৮।

বিস্ফোরণে ৬ জন মারা যায় এবং ৮৯ জন আহত হয়। সংবাদটিতে আরও অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ আছে যা সাংবাদিক প্রতিনিধি মতিন হাফিজ তাঁর প্রতিবেদনে সেনা অফিসার পুরোহিতের স্বীকারোক্তি লেখা খবরের শেষ লাইনে তিনি নিজেই লিখেছেন, মুম্বাইয়ের "এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের" মুখপাত্র দীনেশ আগরওয়ালা বলেছেন সেনা অফিসার পুরোহিত স্বীকারোক্তি দিয়ে দায় স্বীকার করেছেন বলে চালিয়েছেন।

সাংবাদিক হাফিজ সাহেব পাঠকদের কিন্তু জানাননি তাঁর এই চাঞ্চল্যকর সংবাদের সূত্রটি কে বা কারা। পাঠকদের তা জানার অধিকার আছে এইজন্য যে তাঁর একথা মিথ্যা। এমন কোনও স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়নি। এ টি এস-এর অন্য গোয়েন্দারাও এই স্বীকারোক্তি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি।

এবার বুঝুন ব্যাপারটা কী। যে গোয়েন্দাদের কাছে সেনা অফিসার পুরোহিত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন সেই এ টি এসের মুখপাত্রই বলছেন, "ইট ইজ নট কারেক্ট"। তবে টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সাংবাদিক মতিন হাফিজ সাহেব কীভাবে বলছেন যে সেনা অফিসার পুরোহিত "অ্যাডমিটস্ হি ওয়াজ মালেগাঁও মাস্টারমাইণ্ড"। তাই পাঠকদের জানাতে হবে সাংবাদিকের সংবাদ সূত্রটি কী। বোঝায় যাচ্ছে যে বানানো। পরিকল্পিতভাবেই এই খবরটি দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রকেই খবরটি খাওয়ানো হয়েছে। এমন কাজটি করতে পারে "অতি ক্ষমতাবান" পুলিশ প্রশাসনের কেষ্ট-বিষ্টুরা। যারা রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের নির্দেশে চলে। এই বিশেষ চক্রটি সারা দেশজুড়ে এখন সক্রিয়। কংগ্রেসকে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক দখলে সাহায্য করতে এই চক্র মরিয়া হয়ে কাজ করছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আদালতে অভিযোগ প্রমাণ করার দায় মুম্বাই পুলিশের। মিডিয়াকে দিয়ে যা খুশি প্রচার করা যেতে পারে। সেই প্রচার "এভিডেন্স" হিসাবে আদালতে গ্রাহ্য হবে না।

পাকিস্তান দরদী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের কীর্তি ফাঁস

ডঃ জাকির হোসেন

বিশেষ প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুশিরুল হাসান অভিযুক্ত ছাত্রদের আইনি সাহায্য দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। দরাজ হস্তে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে টাকা খরচ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা সরকারি টাকা, আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে জনসাধারণের টাকা। জামিয়ার উপাচার্য সরকারি টাকা দিয়েই সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছেন — সরকারকে উৎখাত করতে, নিরপরাধ মানুষের জীবনহানি ঘটাতে মদত দিচ্ছেন।

এই জামিয়া মিলিয়ার ভাইস-চ্যানসেলর আরো বড় গলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ জাকির হোসেনের স্বাধীনতা সংগ্রামে গৌরবময় অবদানের কথা বলেছেন! তা হলে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হয়।

জামিয়া মিলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন দেশবিভাগকালীন ডামাডোলের সময় মিঃ জিন্নার কাছে চাকুরী প্রার্থী হয়েছিলেন। তাছাড়া নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোনও কোনও মুসলমান কর্মচারীকে কোন দপ্তরে নিয়োগ করা উচিত হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে জিন্নার আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে জাকির হোসেন লিখিতভাবে তাঁর মতামত জিন্নাকে জানান।

১৯৪৭ সালের ৩০ জুন মাদ্রাসা থেকে জামিয়া মিলিয়ার লেটার হেডে লিখিত পত্রে জিন্নাকে "Respected Quaid-i-Azam" সম্বোধন করেন এবং যে, "Pakistan which your utmost superhuman efforts have brought into being" — তার ভিত পোক্ত করতে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন ঃ —"He started with the names of Sri Abdur Rahim and Sir Zafrulla Khan for the constitution-making job and to assist them on the academic side, the names of Dr, I. H. Qureshi of the Delhi University and Dr. Mahmood Hussain of the Dacca University (জাকির হোসেনের ভাই) were suggested.

Three names were suggested for handling issues of finance, currency and the distribution of assets, They were Muhammad Ali, at that time financial adviser to the Government of India, Mr. Zahid Husain of Aligarh and Sir Ghulam Muhammad of Bombay.

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহম্মদ আলি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং গোলাম মহম্মদ গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন।

For matters relating to communications, he had recommended the names of Mr. Z. H. Khan of the Railway Board, Mr. M. Farooq, General Manager, East India Railway, Mian Nizamuddin, General Manager, Nizam State Railway, and Mr. Zahid Husain who was for some time financial adviser to the Railways in India. Mr. Zahid Husain "will also be useful on questions relating to post and Telegraph" and to assist him the names of Sir Ghulam Mahammad and Mr. Zaman Khan, a retired Postmaster General, were suggested.

On questions relating to the Army, H. H. the ruler of Bhopal (ভোপালের নবাব) and Mr

(এরপর ২ পাতায়)

জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

গঙ্গা দূষণ রুখতে

গঙ্গা রক্ষা মঞ্চের সন্তযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বামী রামদেবজী'র নেতৃত্বে গঠিত 'গঙ্গা রক্ষা মঞ্চ '-এর গঙ্গাকে জাতীয় নদী হিসাবে ঘোষণার দাবি শেষপর্যন্ত কেন্দ্র সরকার মেনে নিল। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গঙ্গাকে জাতীয় নদী হিসাবে ঘোষণা করেছেন। হিন্দু সমাজের কাছে গঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, পবিত্রতার প্রতীক ও মা হিসাবে পূজ্য। অথচ গঙ্গার বর্তমান দুর্দশা দেখে প্রত্যেক ভারতীয় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। তাই গঙ্গা রক্ষার দাবিতে গঙ্গা রক্ষা মঞ্চ দেবোত্থান একাদশী অর্থাৎ ৯ নভেম্বর থেকে সাধুসন্তদের নেতৃত্বে সন্ত যাত্রার আয়োজন করেছে। দক্ষিণবঙ্গে মোট চারটি স্থান থেকে — কাটোয়া, গঙ্গাসাগর (নামখানা), রঘুনাথগঞ্জ ও কাঁথি থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। কাটোয়া ও গঙ্গাসাগর থেকে সন্তযাত্রা দুটি ১৬ নভেম্বর কলকাতায় মিলিত হবে। আর অন্য দুটির যাত্রা ১৭ নভেম্বর যথাক্রমে মায়াপুর ও আসানসোলে শেষ হবে।

উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধীর আমলে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হয়েছিল। সরকার এজন্য বিপুল অর্থ খরচ করেছে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। বরং দূষণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। সরকারের সদিচ্ছার অভাব এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রতা এর জন্য দায়ী। তাই সরকারের ভরসায় না থেকে দূষণমুক্ত গঙ্গা প্রবাহের জন্য আমজনতাকে করসেবার কাজে ব্রতী হতে মঞ্চ আহ্বান জানিয়েছে। স্বচ্ছ নির্মল অবিরল ধারায় মা গঙ্গা গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত হোক — এই লক্ষ্য সামনে রেখেই এই সন্তযাত্রার আয়োজন।

গঙ্গা রক্ষা মঞ্চ রাষ্ট্রীয় গঙ্গা সংরক্ষণ প্রাধিকরণ গঠনেরও দাবি জানিয়েছে। মঞ্চের দাবি, টেহরী বাঁধে অবরুদ্ধ গঙ্গাকে মুক্ত করা হোক যাতে সারা বছর ধরে গঙ্গায় অবিরল নির্মল জল প্রবাহিত হয়। এছাড়া গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও মঞ্চ জানিয়েছে।

বর্জ্য পদার্থে দূষিত গঙ্গা।

অসমে বিস্ফোরণের পর মেঘালয়ের নিরাপত্তা জোরদার

সংবাদদাতা ।। অসমে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর মেঘালয়ের পুলিশ রাজ্যের সর্বত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনরায় জোরদার করেছে। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) এস বি সিং জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যে অনুরূপ হামলা ভেস্তে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে লাল সতর্কতা জারী করেছে। সমস্ত পুলিশ স্টেশন এবং আউট-পোস্ট গুলি বিশেষ করে অসম-মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, রাজ্যের ভিতরে প্রবেশের যাতায়াত পথে পুলিশ-ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে। যাতে কেউ লুকিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

বিস্ফোরণের পর মেঘালয়ে এই সমস্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অসম মেঘালয়ের সংযোগকারী ৪০ এবং ৪৪ নং সড়কে তল্লাসী চালানো হচ্ছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরাও ভারত-বাংলা সীমান্ত এলাকায় জনগণের গতিবিধির উপর নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। মেঘালয়ের গারো পার্বত্য জেলা এবং পশ্চিম খাসি পার্বত্য জেলার সঙ্গে অসম এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোলদার করা হয়েছে।

ভারতের শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলিতে আঘাত হানা হচ্ছে

অয়ন প্রামাণিক ।। তিনি ঋষি। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। সনাতন হিন্দু ধর্মের দ্রষ্টা পুরুষ। যাঁর কাছে সনাতন ধর্মই জাতীয়তা। তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সুদূর ফ্রান্স থেকে ছুটে এসেছিলেন যিনি— আজ শ্রীমা নামে তিনি বন্দিত। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে তাই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা ঋষিত্বের এক স্নিগ্ধ স্রোতে যথাক্রমে যেন গোমুখ ও প্রবাহিনী গঙ্গা। আজ সেই ভাবনা আঘাতপ্রাপ্ত এক অপ্রত্যাশিত কঠিন আঘাত যাতে ঋষি অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবন ও অনুভব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তোলা হয়েছে। জনৈক মার্কিনী, পিটার তার গ্রন্থ 'The Life of Sri Aurobindo'-তে লিখেছেন, অরবিন্দের জীবন, লেখনী, চিন্তা -চরিত্রের মধ্যে সাধুতা ছিল না। আরও লিখেছেন, অরবিন্দ আসলে একজন চরিত্রহীন। (''Aurobindo's Character life, Writings, and thoughts did not hold integrity'' ''He possesses a morally loose character'') পিটার হীয, যিনি পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। কলম্বিয়া প্রেস থেকে তিনি বইটি প্রকাশ করেছেন যেটা পেঙ্গুইন ইণ্ডিয়া থেকে পুনর্মুদ্রিত হওয়ার কথা ছিল। ঘটনাচক্রে তা এখন স্থগিত।

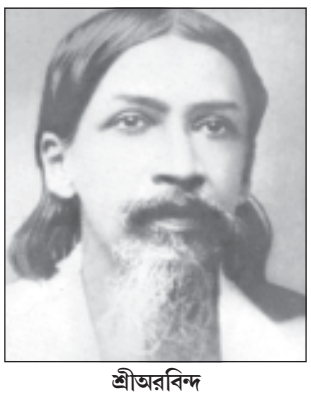

শ্রীঅরবিন্দ

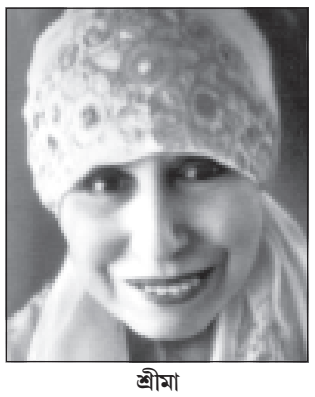

শ্রীমা

ওড়িশা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করেছে এই বই প্রকাশনার উপর। এই কাজটি সম্ভব হয়েছে বালেশ্বরবাসী (ওড়িশা) গীতাঞ্জলী ভট্টাচার্যের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে। জাস্টিস আই এম কাদাসি ও বি পি রায় শুনিয়েছেন — যতক্ষণ গৃহমন্ত্রক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' না মিলছে ততক্ষণ এই প্রকাশনা স্থগিত থাকবে। গীতাঞ্জলী দেবীর আরও দাবী — বইটির লক্ষ্য শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা-এর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করা। ভারতীয় শ্রদ্ধাবিন্দুর উপর এ এক ভয়ঙ্কর আঘাত। তাই তার প্রতিরোধ হওয়া দরকার। কন্ধমালের 'নান' (Nun) ধর্ষিতা হয়, আলোড়ন ওঠে আন্দোলন সংগঠিত হয়। খৃস্টান মিশনারীরা আক্রান্ত হলে তা হয় Hindu Extremist-দের কাজ। তাই বুদ্ধি জীবীদের কাছে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, জাতির শ্রদ্ধাকেন্দ্রগুলিতে এহেন আঘাতের থেকে বড় ধর্ষণ আর কখনও ঘটেছে কিনা?

তাই স্থগিতাদেশ নয়, কঠিন শাস্তি চাই। আর কতদিন দেবীর Nudity নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করবেন হুসেনরা, পিটারের মতো Addicted driver-রা ঋষির অস্তিত্বে কলঙ্ক লাগাবেন?

পুলিশ লেলিয়ে

(১ পাতার পর)

মহিলাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাতেও শুরু করেছে পুলিশ বাহিনী। প্রতিবাদে এলাকার মানুষ নন্দীগ্রামের কায়দায় রাস্তা কেটে পুলিশের গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে। গত চারদিন ধরে লালগড় অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন আদিবাসী নেতাদের বুঝিয়েও অবরোধ তুলে নিতে রাজি করতে পারছেন না। শুধু লালগড় নয় পূর্ব-মেদিনীপুরের গেঁওখালি, শিলিগুড়ির কাওয়াখালি, উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া, আমতলা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিবাদী মানুষকে দর্শন করতে সিপিএমের ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনী একযোগে আক্রমণ শানাচ্ছে। গত দু'তিন বছরে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। সাধারণ মানুষ এখন আরও সিপিএমের ভয়ে ঘরে ঢুকে থাকছে না। যেখানেই প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকছে মানুষ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা লালগড়ের জঙ্গল, কলকাতার চারু মার্কেট হোক বা ডুয়ার্সের চা বাগান। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে সিপিএমকে সরাতে এরাজ্যে একমাত্র পথ জনবিস্ফোরণ। অত্যাচারী সিপিএম নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গর্জে ওঠার দিন বোধ হয় শুরু হয়েছে। আগামী দিনে তা আরও শক্তিশালী হবে। কারণ শিল্পায়ণ উন্নয়নের চেয়েও মানুষের সামনে এখন সিপিএমের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া অনেক বেশি জরুরি। সিপিএমের সেই মুষলপর্ব জনজাগরণের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে।

জাকির হোসেনের কীর্তি ফাঁস

(১ পাতার পর)

Muhammad Ali can be expected to advise on Indian conditions. On major questions of defence, I feel some foreign expert advice will be needed. But the official formal adviser should. I think, be an Indian Muslim'' the letter continued.

ভোপালের নবাব পাকিস্তানে যোগদানের জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। সর্দার প্যাটেল তার দুর্বুদ্ধি অঙ্কুরে বিনষ্ট করেন।

For matters relating to industrial development, the names of Mr. A. Ispahani, Sir Ghulam Mohammad ''and may be Mr Akbor Fozalbheg of Bombay should prove useful''. তারপরে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন ও শিক্ষানীতি নির্ধারণে তিনি যে নিজেকে উৎসর্গ করতে আগ্রহী, সেকথা জানিয়ে মিঃ জিন্নাকে লেখেন — 'If I can be of any service in the framing of education programme, I shall deem it a privilege to be able to do so.''

Concluding the hand written letter, Dr. zakir Hussain said, '' These are just a few names I have been able to think of. I am sure under your inspiring leadership competent Muslims will be able to give a good account of themselves in the development of Pakistan.''

''I am in Madras at present in connection with a conference of the International Students' Sarvice and hope to return to Delhi by the 17th.

With respectful regards,
Your sincerely,
Zakir Hussain

এই চিঠি করাচীর "ডন" পত্রিকায় ১৪ আগস্ট ১৯৯০ তারিখে (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দিবস) প্রকাশিত হয়।

তবে জাকির হোসেনের পাকিস্তানকে সেবা করার আশা জিন্না পূরণ করেননি। ধুরন্ধর জিন্না ভারতের ঘরের শত্রু বিভীষণকে ভারতে থাকতে দেওয়াই বুদ্ধি মানের কাজ মনে করেছেন। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। জাকিরও রাতারাতি জাতীয়তাবাদী মুসলমান বনে গিয়ে মৌলানা আজাদের জুড়ি হলেন এবং জামিয়া মিলিয়া নামে দ্বিতীয় আলিগড় গড়ার কাজে মন দিলেন। বিষবৃক্ষে ফল ফলতে শুরু করেছে!

ভারতে বাস করে পাকিস্তানের মঙ্গল চিন্তায় যার ঘুম হয়নি, সেই জাকির হোসেন হলেন জামিয়া মিলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। সে প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা যে ইসলাম ধর্ম ও পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে ভারতের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হবে, তাতে আর অশ্চর্য কি? আশ্চর্যের বিষয় হল, জাকির হোসেনের এসব কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থেকেও জহরলাল নেহরু তাকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে এবং তার কন্যা রাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ করেন।

সেকুলার হতে হবে যে!

জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি ভবনে ঢুকেই ভেতরে এক মসজিদ গড়লেন। সাধে কি সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন ভারতে একমাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমান হলেন জহরলাল!

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' ছাপ!

ইসলামিক রণকৌশল সম্পর্কে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিগ্রেডিয়ার এস কে মালিক একটি পুস্তক লিখিয়াছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া-উল-হক-এর কথামতো তিনি এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকটির নাম 'কোরানিক কনসেপ্ট অফ ওয়ার' অর্থাৎ যুদ্ধ বিষয়ে কোরানের ভাবনা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের জন্য পুস্তকটি ছিল অবশ্য পাঠ্য। ইংরাজি ছাড়াও উর্দু ও আরবি ভাষাতেও বইটি পাওয়া যায় এবং বিশ্বের জেহাদিদের কাছেও বইটি অবশ্য পাঠ্য।

বইটি হইতে একটি অনুচ্ছেদ পড়িলে যে কাহারও পক্ষেই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বর্বরোচিত চিন্তাভাবনা ও কাজের রূপরেখা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট। বইটির একটি অনুচ্ছেদে লেখা হইয়াছে — শত্রুর মর্মস্থলে আঘাত শুধু উপায় মাত্র নয়, ইহা সন্ত্রাসের উদ্দেশ্যও বটে। বিরোধীদের আঘাত করিবার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি কোনও উপায় নয় — এটা সিদ্ধান্ত।" (Terror is not a means of imposing decission upon the enemy, it is the decission we wish to impose upon him)

সন্ত্রাসের এই দর্শনের প্রেক্ষাপটে ইসলাম একটি উদাহরণও স্থাপন করিয়াছে। ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এর দুইটি সর্বোচ্চ বহুতল ভবন মাত্র কয়েক মিনিটে ধবংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ওই দুই ভবনে সেইসময় কর্মরত তিন হাজারেরও বেশি মানুষ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নৃশংস ধবংসলীলার আর কোনও নজির নাই। সারা বিশ্বের মানুষ এযাবৎ অচিন্ত্যনীয় এই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী। সমগ্র মানবজাতিকেই এই ঘটনা প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছে। বিগ্রেডিয়ার মালিক-এর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে — "সন্ত্রাস প্রকৃতপক্ষেই শত্রুর মর্মস্থলে আঘাত করে।' ২০০১-এ শুধু আমেরিকা নয়, পশ্চিম দুনিয়ার দেশগুলিও সন্ত্রাসের শিকার হয়।

ইতিমধ্যে সকলেই জানিয়া গিয়াছে, পাকিস্তানই সন্ত্রাসের সূতিকাগার। ৯।১১-র ঘটনার পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হইতে আমেরিকা পাকিস্তানকে বাধ্য করে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুশারফকে বলা হইয়াছিল, যদি তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শরিক না হন, তাহা হইলে পাকিস্তান প্রস্তর যুগে ফিরিয়া যাইবে। মজার বিষয় হইল, যে পাকিস্তান একদা তালিবানদের সঙ্গে জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের সৃষ্টি করিয়াছিল, চাপে পড়িয়া তাহাকে সেই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধেই বন্দুকের নল ঘোরাইতে হইল। কৌতুকের আরও একটি বিষয় — একদা আমেরিকাই নিজেদের স্বার্থে এইসব সেনা তথা সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ, সাহায্য এবং আর্থিক মদত যোগাইয়াছিল।

নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধবংসের পর ইসলামিক সন্ত্রাস দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। আর এর ফলে ইউরোপ ও পশ্চিম দুনিয়ায় মুসলিম মাত্রই সন্ত্রাসবাদী বলিয়া সন্দেহভাজন হইয়া উঠে। আজিম প্রেমজীর মতো অনেকেই শুধু মুসলিম হওয়ার জন্য আমেরিকায় অপমানিত ও অত্যাচারিত হন। অর্ধেক দুনিয়াতেই মুসলিমরা ক্ষোভের মুখোমুখি হন।

ওই সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ-এর বিরুদ্ধে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া বহু গবেষণাও হইয়াছে। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধি জীবীরাও নিজেদের মুসলিমপন্থী সাহিত্য প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। সন্ত্রাসের সহিত ইসলামের কোনও সম্পর্ক নাই — ইহাই তাহাদের প্রতিপাদ্য। জেহাদ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য মুসলিমদের কলঙ্কিত করিবার জবাব দিবার জন্য পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আরবের টাকা এই লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে।

আমাদের সংসদের রাজ্যসভায় এক সাংসদ ইসলামি সন্ত্রাস সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে প্রতিবাদের মুখোমুখি হন। অবশ্য তৎকালীন রাজ্যসভার চেয়ারপার্সন নাজমা হেপতুল্লার হস্তক্ষেপে সাংসদ তাঁহার বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন। অর্থাৎ সন্ত্রাসের সহিত ইসলামকে যতই আলাদা করিবার চেষ্টা হউক না কেন, অবিশ্বাসী বা কাফেরদের নির্যাতনের ব্যাপারে জেহাদ-এর লক্ষ্য একই রহিয়াছে। ভারতেও জেহাদের ইতিহাস দীর্ঘদিনের — প্রায় হাজার বছরের। আজও সেই ধারা অব্যাহত। অসমের চারটি শহরে বিস্ফোরণে ৮ জন 'কাফের' নিহত ও শতাধিক আহত হইয়াছে।

দেশবিভাগের কাল হইতে আজ পর্যন্ত ইসলামিক জেহাদের প্রক্রিয়া অব্যাহত এবং যখনই সম্ভব হইয়াছে তখনই ইসলামিক কৃত্য হিসাবে ইহাকে কার্যকর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাই 'ইসলামিক জেহাদ' কথাটা ব্যবহার করা যাইবে না বলিয়া যে দাবি করা হইতেছে, তাহার স্পষ্টতই কোনও ভিত্তি নাই। বরং, যাহারা ইহার শিকার, জেহাদীদের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভকে সঙ্গতই বলিতে হইবে।

এই নির্বাচনের বছরে, মুসলিম ভোট হারাইবার ভয়ে শাসকদল এবং তাহাদের বর্তমান ও প্রাক্তন শরিক দলগুলি একটি কৌশল রচনা করিয়াছে। এইসব রাজনৈতিক দলের নেতারা কোনও কারণ ছাড়াই 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। কোনও হিন্দু সন্ত্রাসবাদীই এযাবৎ কোনও পুস্তক প্রকাশ করে নাই এবং কেউ দন্ড প্রাপ্তও হয় নাই। অবশ্য সংবাদ মাধ্যমের একাংশ ইদানীং প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর-কে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়াইয়া সুর চড়া করিতেছে। হিন্দু সন্ত্রাসবাদ কথাটি ইতিপূর্বে কখনও শোনা যায় নাই। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিন্দুসমাজকে ভীত সন্ত্রস্ত করিবার লক্ষ্যেই এই শব্দ ব্যবহার করিতেছে। বস্তুত, পরম্পরাগতভাবে হিন্দুসমাজ কখনও সন্ত্রাসের পথে চলে নাই।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের মনে হয়, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবুকে কোনও মানুষ এখন ঈর্ষা করেন না। মিথ্যাচার, ভ্রান্তি, হঠকারিতা ও গোঁয়ার্তুমি দ্বারা তিনি তাঁর ভাবমূর্তি এমন জায়গায় নামিয়ে এনেছেন, সেখানে অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছতে পারবেন না।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।

আমাদের সংবিধান বৃটেনের 'ওয়েস্ট মিন্‌ষ্টার মডেল' গ্রহণ করায় শাসনব্যবস্থা সংসদীয় ধাঁচের ('প্রোসিডেন্ট সিস্টেম') হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে আমেরিকার মতো একই ব্যক্তি (রাষ্ট্রপতি) সর্বোচ্চ শাসক ও ক্যাবিনেট প্রধান হতে পারেন না। কেন্দ্রে যেমন রাষ্ট্রপতিকে শাসকপ্রধান হিসেবে রেখেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেটকে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যেও প্রায় সেই ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

১৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল হলেন রাজ্যপ্রধান। কিন্তু ডঃ এম ভি পাইলী সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল হলেন নামমাত্র শাসক ('constitutinal head')। সাধারণ পরামর্শদাতার ভূমিকাই তাঁকে পালন করতে হয়। (অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২০৩)

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীকেই মোটামুটিভাবে রাজ্যের মুখ্যশাসকবলা যায়। ১৬৩ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ক্যাবিনেট রাজ্যপালকে সাহায্য করে, পরামর্শ দেয় আর মুখ্যমন্ত্রী হলেন সেই ক্যাবিনেটের প্রধান (With the chief minister at the head')। তবে বাস্তবে রজ্যপাল পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন, সহকর্মীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্য শাসন করেন। এটাই ক্যাবিনেট ব্যবস্থার রীতি।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কি সেই উচ্চ পদটার মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছেন?

প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী হলেন ক্যাবিনেটের প্রাণপুরুষ। তাঁকে ঘিরেই ক্যাবিনেটের উত্থান পতন ঘটে। তাঁর কাজ হল সমগ্র ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করা। যদিও আমাদের সংবিধান মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বের কথা বলেছে এবং তাঁরা সবাই মিলে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রীই অনেক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করেন এবং ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার দ্বারা ক্যাবিনেটকে স্বমতে নিয়ে আসেন। ডঃ এস. এল. সিক্রির ভাষায় তাঁর কাজ হল 'to co-ordinate, guide, control and direct the activities of the ministers — (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স পৃঃ২৪৬)। অনুরূপভাবে ডঃ মধুমঙ্গল সিং জানিয়েছেন। 'He is the soul of the cabinet and provides the motive power of its policy, control and co-ordinative functions'—(দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ্ ইণ্ডিয়া, পৃঃ৮১৮)। ক্যাবিনেট হল তারই ছায়া।

কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেই কর্তৃত্ব কি রক্ষা করতে পেরেছেন? তাঁর শিল্পনীতি, জমি দখলের ব্যাপারে পুলিশী বর্বরতা সৃষ্টি, তসলিমা বিতাড়ন ইত্যাদি নিয়ে কোনও কোনও মন্ত্রী বিরূপ মন্তব্য করেছেন। টাটাদের সঙ্গে তাঁর কি চুক্তি হয়েছে, সেটা তিনি ক্যাবিনেটকেও জানাননি বলে অনেক মন্ত্রী ক্ষুব্ধ। তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী শুধু সি পি আই (এম) দলের ক্যাবিনেটের প্রধান নন, তিনি কোয়ালিশন সরকার চালাচ্ছেন। তিনি এটা ভুলে গেছেন বলে কোনও কোনও মন্ত্রী প্রকাশ্যেই তাঁর নিন্দা করেছেন। সরিক দলরা এই সব ব্যাপারে দায়িত্ব নিতেও অস্বীকার করেছে। 'এতে যেমন প্রকট হয়েছে ক্যাবিনেটের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, তেমনি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ক্যাবিনেটের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণহীনতার দিকটাও।

আমরা জানতাম, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিরোধ ঘটলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিদায় নেন বা মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বরখাস্ত করেন। (দাপুটে মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকেও জ্যোতি বসুর চাপে সরে যেতে হয়েছিল)। ডঃ বিদ্যাধর মন্তব্য করেছেন — মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ মুখ্যমন্ত্রীকে অবজ্ঞা করে টিকতে পারেন না — 'He, who does not obey him must quit' —(দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ২৯২)। অথচ কয়েকজন মন্ত্রী তাঁকে ধিকৃত করেও দিব্যি তাঁদের পদে বহাল আছেন।

দ্বিতীয়ত, ক্যাবিনেটের নীতি হল — সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই ব্যাপারে মন্ত্রীদের দায়িত্বের স্বীকৃতি। ডঃ হরিহর দাসের মতে, মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সব সিদ্ধান্তের দায় বহন করেন – 'accepts the responsibility for every action of the government' — (ইণ্ডিয়ান ডেমোক্র্যাটিক গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২৭৩)। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী প্রমুখ অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর নীতি ও কার্যকলাপের নিন্দা করেছেন প্রকাশ্যেই। যৌথ দায়িত্বের নীতি কোথায় গেল?

তৃতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রী হলেন ক্যাবিনেটের মুখপাত্র - সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত তিনিই ঘোষণা করেন। ডঃ বি পি রাউত মন্তব্য করেছেন, 'The chief Minister is the which sopkesman of the government. His utteranees and assurances are deemed to be authentic' — (ডেমোক্র্যাটিক কন্‌ষ্টিটিউশান অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২৫৭)। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাপসী মালিকের ব্যাপারে সি বি আই তদন্তের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। অথচ হাইকোর্টে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল-এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে — মুখ্যমন্ত্রীর কথা নয়, তাঁর বক্তব্যই সরকারের প্রকৃত বক্তব্য।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছেন?

চতুর্থত, মুখ্যমন্ত্রী হলেন গরিষ্ঠ দলের নেতাও। দলের ওপর কর্তৃত্ব তার প্রাধান্যের অন্যতম শর্ত। ডঃ জে সি জোহারীর ভাষায় — 'He is the leader of the majorty party' — (ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ৭৪২)। কিন্তু দলের মধ্যেই তাঁর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব বা কর্তৃত্ব কি আছে? দলীয় সম্মেলনে অনেক নেতাই তাঁর শিল্পনীতির সমলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তিনি যেখানে প্রচারে গিয়েছিলেন, সেখানেই দলের ভরাডুবি হয়েছে। তাই পুরসভা নির্বাচনে বিভিন্ন জেলার অনেক নেতাই তাঁকে ডাকতে চান না। এইকান্ডেঅনেক দলীয় কর্মীও তাঁর নিন্দা করে চলেছেন।

> **"সবচেয়ে বড় কথা মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শিল্পায়ন বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। নন্দীগ্রামে ৬৫ হাজার একর জমি সালেমদের জন্য দখল করার জন্য বর্বরতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল — পুলিশ ও ক্যাডারদের নামাতে হয়েছিল ঘাতক ও ধর্ষকের ভূমিকায়। অথচ কৃষক বিদ্রোহ ও বুদ্ধি জীবীদের চাপে তাঁকে পিছু হঠতে হয়েছে।"**

পঞ্চম মত, মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান আমলাদের অনেক ওপরে। কিন্তু কি দেখছি এখন? নন্দীগ্রামে পুলিশী তাণ্ডব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই সেটা ঘটেছিল। যাদবপুরে পাঁচজন ছাত্রীর বাসস্থান তল্লাশীর ব্যাপারটার তিনি নিন্দা করেছেন ১১ জুন। অথচ তার পরদিনই স্বরাষ্ট্রসচিব অন্য সুর গেয়েছেন। পন্ডা, দেবাশিস চক্রবর্তী প্রমুখ বশংবদ পুলিশ অফিসারদের সহায়তায় তিনি যে স্বৈরাচার চালিয়ে যেতে চাইছেন। কিছুতেই সফল হতে পারেনা। এর আগের পুলিশ কমিশনার প্রসূন চক্রবর্তীকে ক্রিকেট কর্তা হিসেবে বসাতে গিয়েও তিনি আত্মমর্যাদা নষ্ট করে ছিলেন। ডালমিয়ার নির্বাচনকে বলেছিলেন 'অশুভ শক্তির জয়।' সেই ডালমিয়া কিন্তু আবার জয়ী হয়েছেন, অথচ প্রসূনবাবুর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে রিজওয়ানুরের ব্যাপারে।

সবচেয়ে বড় কথা মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, শিল্পায়ন বা অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। নন্দীগ্রামে ৬৫ হাজার একর জমি সালেমদের জন্য দখল করার জন্য বর্বরতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল — পুলিশ ও ক্যাডারদের নামাতে হয়েছিল ঘাতক ও ধর্ষকের ভূমিকায়। অথচ কৃষক

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

লাদেন কীর্তি

ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে সব মহলেই জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। এখন শোনা যাচ্ছে লাদেন তার জীবন সংগ্রামের ওপর একটি বই লিখেছে। তবে কি লাদেন হিংসার পথ ছেড়ে শান্তির রাস্তায়! এমনটা ভাবার অবশ্য কোনও কারণ নেই। তার লিখিত বইটিতে কোনও শান্তির উপদেশ থাকছে না। বইটিতে মুসলিম মৌলবাদীদের প্রশিক্ষণ, অর্থ সংগ্রহ এইসব বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। ৯/১১-র হামলার প্রসঙ্গটিও লাদেন উল্লেখ করেছে বলে জানা গেছে। বইটির প্রকাশই এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিশ্বজুড়ে।

বিপাকে বৃন্দা

মালেগাঁও-র ঘটনায় বিজেপি ও উগ্র হিন্দুত্বের ঘটনা তুলতে গিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছেন খোদ বৃন্দাই। এমনিতেই সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্যা বৃন্দা কারাত ও তাঁর দলের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। এমত অবস্থায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তা ব্যুমেরাং হয়ে বৃন্দারই বিপদ ডেকে এনেছে। বিজেপির নেতারা বৃন্দার বিবৃতিতে বেজায় চটেছেন। তাঁরা একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে চলেছেন বামবাদীদের মিথ্যা শিল্পনীতির কুচক্র ফাঁস করার জন্য।

ইঁদুর নিধন

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছেড়ে পাকিস্তানের সংসদ ভবন এখন ইঁদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। শুনতে আবোল-তাবোল শোনালেও ঘটনা সত্যি। সংসদ ভবনে কম্পিউটারের তার ও প্রয়োজনীয় ফাইল-পত্র কেটে দেওয়ায় কর্তৃপক্ষ ইঁদুর নিধনে নেমেছে। তবে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী না হলেও ইঁদুর নিধন যুদ্ধে সফল হয়েছে।

ট্রাফিক কন্ট্রোল

কলকাতার ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগটা নতুন নয়। কিন্তু আর যাতে কোনও অভিযোগ না ওঠে সে কথা মাথায় রেখেই কলকাতার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজিট্যাল ম্যাপ বসানো হবে রাস্তায়। এই মাপের মাধ্যমে লালবাজার কর্তারা গাড়ির ট্রাফিক রুল ভাঙা থেকে জ্যাম হওয়া, গাড়ির স্পিড সব কিছুই জানতে পারবেন। থাকছে সিগন্যালগুলিতে ওভারহেড ক্যামেরা। ট্রাফিকে মেডিকেল কিটও বসানো হবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য। এটা কবে কার্যকর হবে তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

কমপিউটার প্রীতি

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের থেকেও মার্কিন নারীদের কাছে কমপিউটার বেশি আপন। এমনকী নিজের স্বামীর থেকেও তাঁরা কমপিউটারকে বেশি ভালোবাসেন। সম্প্রতি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এক অনলাইন সমীক্ষায় এই তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে। আড়াই হাজারেরও বেশি মার্কিন মহিলাদের বক্তব্য কমপিউটারের প্রতিই আমাদের ভালোবাসা বেশি। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, স্বামী তথা পরিবারের সঙ্গে সেখানে তারা ৩.৬ ঘন্টা সময় কাটাচ্ছেন, যেখানে কমপিউটারের সঙ্গে সময় কাটানোটা প্রায় তিন গুণ বেশি — ৯.৩ ঘন্টা।

কালোর জাদু

কথায় বলে কালো ভুবন আলো। নব নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেও প্রবাদ বাক্যটার ব্যতিক্রম হয়নি। কৃষ্ণাঙ্গ ওবামা প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হওয়াই কালো-রঙের গুণেই আনন্দে মেতে উঠল ওবামার আত্মীয় স্বজনেরা। কেনিয়ায় বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজনেরা বলেন, আমরা এবার হোয়াইট হাউস যাচ্ছি। কালোর গুণের এই আনন্দ বোধ হয় প্রথম অনুভব করলেন ওবামা।

ক্ষুব্ধ

চীনের ওপর বেজায় চটেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের ধারণা ছিল চীন পাকিস্তানকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবে। কিন্তু চীন সেদিকে পা বাড়ায়নি। পাকিস্তানের আর্থিক দুরবস্থায় পাক-রাষ্ট্রপতি জারদারি ভেবেওছিলেন, চীন এই দুর্দিনে তাঁদের সহযোগিতা করবে, কিন্তু তা হয়নি। এদিকে চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের কৃষি, খনিসত্ত্ব, টেলিকমিউনিকেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ১১টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই চীনের এই ধরনের ব্যবহার পাকিস্তানের দিক থেকে কতটা সুখকর হবে সেটাই এখন দেখার।

কাঠগড়ায় চীন

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে-র পর এবার বাংলাদেশ সরকারও চীনের খাদ্যদ্রব্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো। সরকারি পক্ষ থেকে জানানো হয়, চীন থেকে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিশেষ করে দুধে ক্ষতিকর ম্যালমাইনের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। সরকারের পক্ষ থেকে উপদেষ্টা শওকত আলির বক্তব্য, বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের বিশ্লেষণাত্মক তথ্য গবেষণাগার থেকে বিস্তৃতভাবে পাওয়ার পর চীনের পণ্যের ব্যাপারে কড়াকড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

যৌথ লড়াই

অসম জুড়ে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা শুরু হয়েছে তা আটকাতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে যৌথভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিল অগপ। গৌহাটিতে এক বিবৃতিতে এ জি পির সাধারণ সম্পাদক পদ্ম হাজারিকা বলেন, ভোটের রাজনীতি ও ক্ষমতাভোগের লালসায় তরুণ গগৈ সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের তোয়াজ করে চলেছে তার অবসান ঘটাতেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে যৌথভাবে লড়াই করে কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে তৎপর হবেন তাঁরা।

ছদ্মবেশী ডাকাত

দীর্ঘদিন যারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে এসেছে আমরা নিরপেক্ষ নই — মেহনতি মানুষের পক্ষে, প্রকৃত পক্ষে কেন তারা মেহনতি মানুষের পক্ষে তা তথ্য প্রমাণ সহ তুলে ধরল কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট। রিপোর্টে প্রকাশ, মিড-ডে মিলের চাল-ডাল অধিকাংশই খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত সিপিএমের নেতারা। ক্যাগের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দু'শো কোটি টাকার নয়ছয় হয়েছে মিড-ডে মিলে। শুধু তাই নয়, বহু জায়গায় মিড-ডে মিলের নামে যা ছিটেফোঁটা দেওয়া হয়েছে তাও উপযুক্ত নয়।

বিদ্যার্থী পরিষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুম্বাই-এর কাছে মালেগাঁওতে যে সাইকেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যার্থী পরিষদকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্য যেভাবে মহারাষ্ট্র পুলিশ ও এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম উঠে পড়ে লেগেছে তাকে বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছে। গত ৬ নভেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক বিল্লেশ্বর সিংহ জানান, এই দোষারোপ সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে বিদ্যার্থী পরিষদ অনুপ্রবেশ বিরোধী আন্দোলনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাতে দেশের জাতীয়তা বিরোধী অংশ ক্রমশ ভীত হয়েছে। এই বছরের ১৩ মে জয়পুরে হনুমান মন্দিরে, ২৫ জুলাই ব্যাঙ্গালোরে, ২৬ জুলাই আমেদাবাদে, ১৩ ও ১৯ সেপ্টেম্বর রাজধানী শহর দিল্লীতে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের পেছনে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের হাত সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে মুম্বাই-এর এই এলাকায় পাঁচ ব্যক্তি ও গুজরাট ঘেঁষা সবরকণ্ঠ জেলার মোদাসায় বিস্ফোরণে একজন নিহত হন। দুই চাকার সাইকেলে রাখা বোমা থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পরেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায় যে, উক্ত বিস্ফোরণকারী সাইকেলটি সিমির বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিসের তলায় রাখা ছিল এবং সাইকেলের সিটে উগ্র ইসলামী মৌলবাদসিক্ত স্টিকার লাগানো ছিল। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য বিস্ফোরণের ঘটনাগুলির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে একথা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সিমি বা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জঙ্গিরাই। তবুও বিদ্যার্থী পরিষদ-এর মতো জাতীয়তাবাদী ও গঠনমূলক ছাত্র সংগঠনকে কলুষিত করার জন্য এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম ও রাজনীতিকদের এই প্রচেষ্টা নিন্দনীয়। তাদের এই ষড়যন্ত্র একদিকে যেমন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী তথা দেশের বিভিন্ন অংশে বিস্ফোরণকারীদের উৎসাহিত করবে, তেমনই জাতীয় সংহতিরও ক্ষতিসাধন করবে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যার্থী পরিষদ দাবি জানিয়েছে যে, যারা এই সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

আউসগ্রামে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা

সংবাদদাতা ।। সিপিএমের সাঁড়াশি আক্রমণে বিধবস্ত বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম পঞ্চায়েত বিজয়ী বিজেপি - তৃণমূল শাসিত পঞ্চায়েত সদস্যরা। বর্ধমান জেলার বিজেপি সভাপতি অর্ধেন্দু বিশ্বাসের বক্তব্য, পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়েই পরিকল্পিতভাবে বিজেপি সদস্য ও সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে সিপিএম ক্যাডাররা।

শ্রীবিশ্বাসের বক্তব্য, একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না, অন্যদিকে আবার সিপিএম ক্যাডারদের ওই প্রকল্পগুলির টাকার জন্য লেলিয়ে দিচ্ছে। গত ২৩ অক্টোবর সিপিএম-এর কর্মীরা ডেপুটেশনের নামে বিজয়ী পঞ্চায়েত সদস্যদের হেনস্থা, এমন কী বিজেপি সদস্য ও সমর্থকদের উপর হামলা, তাদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুঠ করেছে, মা-বোনেদের উপর অত্যাচারও করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা

(৩ পাতার পর)

বিদ্রোহ ও বুদ্ধিজীবীদের চাপে তাঁকে পিছু হঠতে হয়েছে। রায়চক নিয়েও তিনি বিরাট ধাক্কা খেয়েছেন। তাঁর নয়াচরের কেমিকেল হাবের পরিকল্পনাকেও বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদরা মেনে নেননি।

তবে সিঙ্গুর নিয়েই তিনি নিজেকে বেশি খেলো করেছেন। মমতা ব্যানার্জীর অনশনের সময় রাজ্যপাল তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু বুদ্ধবাবু কথা বলেননি। জ্যোতি বসু ও অশোক ঘোষের সঙ্গে বিরোধী নেত্রী বৈঠকে বসেছিলেন — কিন্তু সেগুলোকে ভেস্তে দেওয়া হয়েছে। আর এবার মমতা ব্যানার্জীর ধর্ণার সময় তিনি কথা বলতে চেয়েছেন — তবে জানিয়েছিলেন যে, সিঙ্গুরের কারখানার প্ল্যানটা পুরোপুরি অক্ষত রেখেই এবং আইনের কাঠামোতেই রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু যদি সেই প্ল্যান অক্ষত রাখতেই হয়, তাহলে কথা বলে লাভ কি? আর তাঁদের মতে, জমি ফেরৎ দেওয়ার আইনগত বাধা আছে। কিন্তু রাজ্যপালের উপদেষ্টা প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী ও প্রাক্তন ভূমি সচিব দেবব্রত ব্যানার্জী জানিয়েছেন — আইনগত বাধা আদৌ নেই, দরকার সদিচ্ছার।

আরও বিচিত্র ব্যাপার হল — রাজ্যপালের উপস্থিতিতে দুই পক্ষের যে চুক্তি হয়েছে, পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রী সেটাকে বাতিল করেছেন টাটার স্বার্থে ও দলীয় চাপে। এর ফলে তাঁর ও তাঁর সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। এমন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

নন্দীগ্রামের সেই ঘৃণ্য নরহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও জন নিগ্রহের পর এই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। রাজ্যপালের মধ্যস্থতায় চুক্তি করেও তিনি যেভাবে তা লঙ্ঘন করেছেন, তাতে তাঁর আর এক মুহূর্তও এই পদে থাকার অধিকার নেই।

রাজ্য রাজনীতি

সরকারি কর্মীরা ক্রমশ সি পি এম বিরোধী হয়ে উঠছে

নিশাকর সোম

শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ানদের ফেরার সময়ে ধানের ক্ষেতে ল্যান্ডমাইন-এর বিস্ফোরণ ঘটে এবং একাধিক পুলিশ কর্মচারী গুরুতর আহত হন। পুলিশের গাড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই ঘটনার জন্য পুলিশের ডি জি ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। এখন নিচের তলার পুলিশ কর্মীদের উপর শাস্তির খাঁড়া নেমে আসছে। এর ফলে পুলিশবাহিনীর নিচের তলার অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধ দেববাবুদের অন্যতম সহায়ক বন্ধু হল পুলিশ। তাঁরা ধীরে ধীরে বুদ্ধ দেববাবুদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। এর প্রতিক্রিয়া আগামী নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যেতে পারে। শালবনীর এই বিস্ফোরণের ঘটনা প্রমাণ করে দিল বুদ্ধ বাবুর নিজস্ব পুলিশ দপ্তর-এর সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। বস্তুত পুলিশমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধ বাবু ব্যর্থ। তিনি তো স্বরাষ্ট্রসচিবের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন বলে শোনা যায়।

শালবনীতে বুদ্ধ দেববাবু যখন চড়া সুরে আবার বক্তৃতা করেছেন, ঠিক সেই সময়ে ন্যানো বাঁচাও কমিটির আড়ালে সিপিএম-এর অ্যাকশন স্কোয়াড সিঙ্গুর-এ তুমুল হাঙ্গামা করছিল। সিপিএম নেতারা কাঁদুনি গেয়ে বলেন, বিগত ৩১ বছরে তাদের হাজার হাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এখনও হত্যা করা হচ্ছে। এটাও বুদ্ধ বাবুর প্রশাসনিক ব্যর্থতা। বুদ্ধ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ব্যর্থ। শুধু এই ব্যাপারে নয়, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সমবায় সমস্ত দপ্তরের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। বুদ্ধ বাবু পরিচালিত মন্ত্রিসভা প্রায় গোটা ২০০৮ সালটা নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে কাটিয়ে দিল। পূর্ত বিভাগ এর বাইরে নয়। মন্ত্রিসভার মধ্যে ঘোঁট পাকিয়ে তিন মন্ত্রী তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন বলে রটনা আছে। বুদ্ধ বাবুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পছন্দের মন্ত্রীদের কথা শোনেন। বুদ্ধ বাবু পার্টি সিদ্ধান্তের খুব একটা ধার ধারেন না। অনেক সময় তিনি যে নিজের সিদ্ধান্তে কাজ করে পরে পার্টিকে জানান, নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমবঙ্গের গোটা সিপিএম পার্টিও শুধুমাত্র নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর-পঞ্চায়েত করে কাটিয়ে দিল। এর ফলে নির্বাচনী কর্মীরা (ম্যাসলম্যান) পার্টিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এখন বিমানবাবু কপাল চাপড়ে বলছেন — "এদের তাড়াও।" কে তাড়াবে? লোকসভা নির্বাচন সামনে। জিততে গেলে এই 'লড়াকু জঙ্গি'দের পরিষেবা একান্তই অপরিহার্য। তাই বিমান বসু যতই চেষ্টা করুন,সাতমন তেলও পুড়বে না — রাধাও নাচবে না। বস্তুত বিমান বসু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে নিঃসঙ্গ। রাজ্য কমিটিতে তাঁর দু-একজন ভক্ত আছেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচুর ক্ষোভ নানা জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে। সিপিএম দল যে শুধু রাজনৈতিক ভাবে অধঃপতিত হয়েছে তাই নয়, পার্টির নেতাদের মধ্যে জনগণ সম্পর্কে মমত্ববোধও নেই। কারণ নেতারা মমতা বিরোধী।

পুরুলিয়াতে জেলা সভাপতি করা নিয়ে পার্টির মধ্যে বেশ কথা চালাচালি হচ্ছে। বিমান বাবুর বিরুদ্ধে ফিসফিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাইতো মদন ঘোষ অ্যান্ড বর্ধমান কোং ধীরে ধীরে রাজ্য-নেতৃত্বে মূল চালক হয়েছেন। রাজ্যের এমন একটা জেলা, জোনাল কমিটি, লোকাল কমিটি, এমনকী ব্রাঞ্চ ও নেই — যেখানে গোষ্ঠী বিভাজন হয়নি। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছক কষতে ব্যস্ত। চুলোয় যাচ্ছে পার্টির কাজ, জনগণের কথা শোনা। জনগণের উপর হুকুমদারি করেই নিচেরতলার কর্মীদের কাজ শেষ করা হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পার্টির সম্মেলন, মিছিল ও অর্থসংগ্রহ এবং ভোটে জেতাই তো একমাত্র লক্ষ্য।

কাজেই নিচের তলার কর্মীরাই তো লিডারদের ল্যাডার। অতএব কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করার সাধ্য হবে না নেতৃত্বের। সিপিএম পার্টিতে যেহেতু নিজেদের আখের গুছিয়ে নিজের মতে চলছে — সেজন্য নিচেরতলার কর্মীরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে বসে যাচ্ছে এবং যাবেই।

সম্প্রতি মহাকরণে কো-অর্ডিনেশন-কমিটির সঙ্গে এর পাল্টা সংগঠনের মহারণ হচ্ছে। সরকার ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি তদের নিন্দা করছে। ভুলে গেলে চলবে না, এই মহাকরণেই মুখ্যমন্ত্রীকে সিপিএম পরিচালিত কো-অর্ডিনেশন কর্মীরা শারীরিক লাঞ্ছনা করতে দ্বিধা করেনি। এখন পাল্টা সংগঠন সেই পথেই চলেছে। ধীরে ধীরে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ সরকার তথা সিপিএম বিরোধী হয়ে উঠছে। স্মরণ করা দরকার, কো অর্ডিনেশনের অন্যতম স্থপতি অমল গাঙ্গুলিকে পার্টি বহিষ্কার করেছিল। সেই অমল গাঙ্গুলিই আজকের এই পাল্টা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এরপরও কো-অর্ডিনেশনের আর এক নেতা হিরণ সান্যালকেও বহিষ্কার করা হয়। এইভাবেই কো-অর্ডিনেশন-এর ক্ষয় শুরু হয়। এখন যাঁরা কো-অর্ডিনেশন করেন, তাঁরা প্রমোশন ও চাকরীর নিরাপত্তার জন্য কো-অর্ডিনেশনের সঙ্গে আছেন। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই সিপিএম বিরোধী। কো-অর্ডিনেশনের নেতারাও নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর-টাটা-বন্দনা কে নিন্দা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। পার্টির কাছে তাঁদের সমালোচনা পাঠিয়েছেন। ভবিষ্যতে এঁদের সহায়তা পাবার জন্য বিরোধীদের ইতিবাচক ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী অতীতের কমিউনিস্টদের নেতিবাচক ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়েছেন। এতে ব্যাপক জনগণকে টানা যাবে না। তদুপরি বিজেপি-কে সমালোচনা করে বিরোধী ঐক্য সফল করা যাবে না।

রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ম্যালেরিয়া সংক্রামক হয়েছে। ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া-এর আক্রমণ এগিয়ে চলেছে। সরকার নিস্পৃহ। হাসপাতালের অবহেলায় এতদিন রোগী মারা যেতেন, এখন নার্সও মারা যাচ্ছেন। এস এস কে এম হাসপাতালে নৈরাজ্য চলছে। তবুও সরকারের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে বিরোধীদের দাবি সম্বন্ধে ভেবে দেখা উচিত।

রাজ্য কমিটির সদ্য সমাপ্ত সভাতে পার্টির পচনের স্পষ্ট চিত্র দেখা গেছে। রাজ্য পার্টি নেতৃত্বকে অপদার্থ, টাটা-কে খুশী করার কৌশলের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। পার্টি সংগঠনকে চাঙ্গা করার জন্য বুলি আওড়ানো হচ্ছে। এদিকে পুলিশ- প্রশাসনের ব্যর্থতায় মাওবাদী আক্রমণে পার্টির নেতা কর্মী মরছেন। হায় পুলিশমন্ত্রী নিজের পার্টির লোককে রক্ষা করতে ব্যর্থ!

সম্প্রতি মহাকরণে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে এর পাল্টা সংগঠনের মহারণ হচ্ছে। সরকার ও কো-অর্ডিনেশন কমিটি তদের নিন্দা করছে। ভুলে গেলে চলবে না, এই মহাকরণেই মুখ্যমন্ত্রীকে সিপিএম পরিচালিত কো-অর্ডিনেশন কর্মীরা শারীরিক লাঞ্ছনা করতে দ্বিধা করেনি। এখন পাল্টা সংগঠন সেই পথেই চলেছে।

সম্প্রতি মহাকরণে সরকারি কর্মীদের বামবিরোধী মিছিল।

অন্যরকম

বাবার আশীর্বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জীবনের ওপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটাটা কম কাটেনি। বলা যেতে পারে ভাগ্যের বিড়ম্বনা। শনির সাড়ে সাত বা রাহুর দ্বাদশে থাকার মতোই দুঃখ কষ্টটা ভোগ করতে হয়েছে তাকে। তবুও সবকিছু মেনে নিতে পেরেছে প্রজ্ঞা ভারতী। শত দুঃখের মাঝেও বাবা বৃহস্পতি'র মতো মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন। বাবা ডঃ ধরমবীর ভারতী বার বার মেয়েকে বলেছেন, তুই পারবি মা। বাবার ওই কথাটাই আশীর্বাদ কবচের মতো প্রজ্ঞাকে বিপদে-আপদে রক্ষা করেছে। বেঁচে থাকতে প্রেরণা জুগিয়েছে। বলা যেতে পারে হারিয়ে যেতে দেয়নি প্রজ্ঞাকে।

বাবার সঙ্গে প্রজ্ঞা ভারতী। কোলে সন্তান।

জীবনে দুঃখটা ভালোই ভোগ করেছে প্রজ্ঞা। যেদিন স্বামী ডিভোর্স দেয় সেদিন চোখে অন্ধকার বললেও বোধ হয় কম বলা হয়। একেবারে দিশেহারা অবস্থা তখন প্রজ্ঞার। গর্ভে সন্তান নিয়ে কী করবেন তা ভাবার মতো বোধ শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে গিয়েছিল। বাবাই সেদিন প্রজ্ঞার পাশে দাঁড়িয়ে শুধু সান্ত্বনা দেননি, পথের দিশাও দেখিয়েছেন। তুই পারবি খুকি। হ্যাঁ প্রজ্ঞা পেরেছে।

বাবার সেই কথাই প্রজ্ঞার মনোবল শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে উপযুক্ত করে তুলেছে, সমাজ ও সংসারের জন্য। তাই সেই বাবা যেদিন বিদায় নিলেন তখন প্রজ্ঞা শোকে ভেঙে পড়লেও বিপদে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে। দাদার অনুপস্থিতিতে সমাজ সংসারের রীতি-নীতির যূপকাষ্ঠে বলি না হয়ে, বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াটুকুও সে নিজেই সামলেছে। প্রজ্ঞার নিজের কথায় — বাবা কোনও দিন মেয়ে আর ছেলের মধ্যে পার্থক্য করেনি। আমাকে বাবা মেয়ে বলে ভাবত না। আমি তার কাছে ছেলের মতোই।

প্রজ্ঞা আজ আর পিছনের দিকে তাকায় না। কেনই বা তাকাবে? বাবার আশীর্বাদ যেখানে সঙ্গী, সেখানে ভাবনা কীসের? প্রজ্ঞার ছোট্ট ছেলেটিও জানে দাদু তাদের সঙ্গে রয়েছে। দাদু কষ্ট পাবে বলে সে কোনও দিন দুষ্টুমি করে না। প্রজ্ঞা বাঁচতে শিখেছে। 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম' কথাটার আক্ষরিক অর্থ নয়, মর্মটাও সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভব করতে পেরেছে। আজও যেন বাবার কথাটা দৈববাণীর মতো তাঁর কানে ভেসে আসে। বাবার উপদেশটা তাকে কখনও মৃত্যুর কাছে যেতে দেয়নি। প্রজ্ঞার মতে তাঁর বাবা যেন আজও বলছেন 'তুই পারবি'।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দখল করতে 'চিকেন নেক'-কে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে আই এস আই

সংবাদদাতা।। সাম্প্রতিক ধারাবাহিক বিস্ফোরণ কোনও অকস্মিক বা হঠাৎ করে আচমকা ঘটে যাওয়া ঘটনা আদৌ নয়। তা এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অঙ্গ, যে ষড়যন্ত্রে

সালাউদ্দিন

সামিল পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং তাদের বাংলাদেশী দোসর ডি জি এফ আই বা ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স— যা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা শাখা। অনেকদিন ধরেই তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয়, বিভিন্ন ভারত বিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র, অন্যান্য সরঞ্জাম ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে আসছে। এর পিছনে উদ্দেশ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দখল নেওয়া। সেজন্য সরু শিলিগুড়ি করিডর যা 'চিকেন নেক' বলে পরিচিত এলাকাটিকে ভারত বিচ্ছিন্ন করা। আর, ভারত সরকার জম্মু-কাশ্মীরে যে পাক-মদত পুষ্ট প্রক্সি-ওয়ার -এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে সেরকমই আর একটা ফ্রন্ট উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খুলতে বাধ্য করা এবং ভারতের উন্নয়নকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত রাখা। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে বাংলাদেশী মুসলমানদেরকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে জেলায় জেলায় জনসংখ্যার আনুপাতিক ভারসাম্যকে আমূল পালটে দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ করা ছিল আই এস আই-এর

অসমে হিন্দীভাষী শ্রমিক নিহত। (ফাইল চিত্র)

প্রথম দফার কর্মসূচী। এবং তার পর পরই ওই অনুপ্রবেশকারীদের নাম নানা কৌশলে ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বা শক্তি সঞ্চয়। একজন গোয়েন্দা দপ্তরের বড় অফিসারের কথায় — "আই এস আই- ডি জি এফ আই-এর যুগ্ম ষড়যন্ত্রজাল অসমের কমপক্ষে বারোটি জেলাকে মুসলিম বহুল করে ফেলেছে। দ্বিতীয় দফায় তারা ওই অবৈধ বাংলাদেশী মুসলিমদের দিয়ে স্থানীয় অসমবাসীদের অবদমিত করে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে।"

প্রথম প্রথম আই এস আই — ডি জি এফ আই একযোগে অসমের শক্তিশালী সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'উলফা'-কে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং সেই সঙ্গে অসমে কর্মসূত্রে বহুপূর্ব থেকে বসবাসকারী হিন্দীভাষীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে, হত্যা করে অসম ছাড়া করার ষড়যন্ত্রে অনেকটাই সফল হয়েছিল। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ওই হিন্দীভাষীরা সকলেই হিন্দু। সেজন্য গোষ্ঠীদাঙ্গা বাধিয়ে অসমীয়া সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দিয়ে অসমকে হিন্দীভাষী হিন্দুশূন্য করার মারাত্মক ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে নজরদারি ও পাহারা জোরদার হওয়ায় আই এস আই তাদের লক্ষ্যস্থল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে।

অসমের ৩০ অক্টোবরের বিস্ফোরণের তদন্তে নিযুক্ত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা অন্তত কুড়ি জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাদের মতে অসম-বিস্ফোরণে বাংলাদেশ ভিত্তিক উগ্র ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী হুজি বা হরকত উল জিহাদ আল ইসলামি ও উল্ফার যোগসাজস রয়েছে। এছাড়া অসম বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক সিকিউরিটি ফোর্স-ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন। তারা আরও ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

জানতে পারা গিয়েছে যে, ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর ক্যাডাররা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্ফরাবাদে ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিল-এর আহ্বানে গত বছরের ডিসেম্বরে এক সভায় যোগ দিয়েছিল। সেই সভায় স্থির হয়েছিল ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে আক্রমণ করা হবে। তার বাস্তবায়ণ এখন বিভিন্ন বিস্ফোরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

মিজোদের 'কূট' উৎসব মণিপুরে

সংবাদদাতা।। প্রতি বছরের মতো এবারও ফসল তোলার পর 'কূট' উৎসব পালন করেছে মণিপুরের কুকিচিন মিজো গোষ্ঠীগুলি। মণিপুর রাইফেলস মাঠে উৎসবের মূল অনুষ্ঠানে শতশত লোক হাজির ছিলেন। এই উপলক্ষে ওই গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। 'কূট' উৎসবের এই দিনটিকে রাজ্য সরকার ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই বর্ণাঢ্য কূট উৎসবে কুকিচিন মিজো গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল গুরবচন জগৎ, মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিং, অন্যান্য মন্ত্রী, বিধায়ক, প্রশাসন ও নিরাপত্তা আধিকারিকগণ। রাজ্যপাল বলেন, 'কূট' উৎসব কৃতজ্ঞতা, দয়া, আনন্দোচ্ছলতার প্রতীক। জাতি, ধর্ম, বর্ণের বৈষম্য ঘুচিয়ে নিজ নিজ চিন্তা ভাবনা ও নীতিবোধকে স্বচ্ছ করে তুলে শান্তি, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, ক্ষমাশীলতা ও সহাবস্থানের বার্তা ছড়িয়ে দেয় 'কূট' উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধির দিক নির্দেশমূলক বার্তা নিয়ে এসেছে কূট উৎসব।

বাংলাদেশে ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুই দল

বিশেষ সংবাদদাতা।। সংশয় সন্দেহ থাকলেও বাংলাদেশ নির্বাচনের দিকেই যাচ্ছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। আওয়ামী লীগ ও বি এন পি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, তারা নির্বাচনে যাচ্ছে এবং ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে দু'দলই। নির্বাচন কমিশন ২ নভেম্বর তফশিল ঘোষণা করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে দুই শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা নেই বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, দুই নেত্রীই যে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবেন সে ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই। ভবিষ্যতে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন তারা আনবেন — এটাই প্রত্যাশা। তাঁর মতে, বাংলাদেশ এখন নির্বাচনী মহাসড়কে।

বি এন পি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেছেন, তাদের নির্বাচন করতে কোনও বাধা নেই। তবে বি এন পি নির্বাচনে যাবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন যে, বি এন পি নির্বাচনী ইসতেহার প্রস্তুত করছে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ বলেছেন, শেখ হাসিনারও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনও বাধা নেই। কেননা তিনি কোনও মামলায় দণ্ডিত হননি। নির্বাচন কমিশনও অনুরূপ ধারণা পোষণ করছেন। বিশেষ আদালতে দায়ের করা একটি চাঁদাবাজির মামলা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। দুটি মামলায় তার জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি হয়নি। হাইকোর্ট বলেছে, তিনি নির্বাহী আদেশে মুক্ত থাকায় বিদেশে চিকিৎসার জন্য জামিনের প্রয়োজন নেই। দেশে ফিরে জামিনের আবেদন করতে পারবেন। বি এন পি চেয়ারপার্সন অবশ্য সবকটি মামলায় জামিন পেয়েছেন। তবে অপর একটি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

বেগম খালেদা

শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছে, শেখ হাসিনা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। তার আইনজীবীরাও

বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা তার আগমন উপলক্ষে ব্যাপক অভ্যর্থনা — (যদিও জরুরী অবস্থায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ)। বিমানবন্দরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দলীয় নেতা কর্মীরা বড় ধরনের শো-ডাউন করেছিলেন।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা নির্বাচনের জন্য নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহটি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন নিয়ে এখন আর সংশয় নেই। জনমনে সংশয় রয়েছে নির্বাচনটি কেমন হবে, নির্বাচনের আগে ও পরে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে কিনা।

অনেকের ধারণা, বি এন পি ও তার সহযোগী জমিয়ত শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বয়কটও করতে পারে। তাদের ধারণা নির্বাচন পিছিয়ে গেলে তারা লাভবান হবে, আর নির্ধারিত সময়ে হলে আওয়ামী লীগ লাভবান হবে। বর্তমান অবস্থায় নির্বাচন বয়কট করে লাভবান হওয়া যাবে না বলেও বিশ্লেষকরা দাবি করেছেন। সেক্ষেত্রে বি এন পি ও আওয়ামী লীগ সহ সব দলই নির্বাচনে অংশ নেবে।

কড়া শাসনেই কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শায়েস্তা হতে পারে

লক্ষ্মীকান্ত হাটী

স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে অঙ্গহানি করার চেষ্টা চলছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার অভাবে ও রাজনৈতিক অবহেলার জন্য কাশ্মীর খন্ডিতরূপে আমাদের মাতৃভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই মাতৃভূমির অন্যান্য রাজাদের মতো জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা হরি সিংও ভারতভুক্তি চুক্তিতে সাক্ষর করেছিলেন। সেই সময় সংবিধান পরিষদে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের ৩৭০ ধারায় বিশেষ সুবিধার কথা বলা হয়েছিল, যাতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে চাল, ডাল, লবন, ভোজ্য তেল, জ্বালানী তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেশের অন্যান্য অংশের বিপরীতে প্রচুর ভরতুকী দিয়ে সরবরাহ করা হবে। এবং জম্মু-কাশ্মীরে এখনও ওই ভরতুকী বজায় আছে। স্বাধীনোত্তর দেশের নেতৃবৃন্দ ও এখানকার তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা মনে করেছিলেন এবং এখনও মনে করেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাব ও ভাবনার বোধ হয় আর অবকাশ থাকবে না। কিন্তু স্বাধীনতার ৬২ বছর পরও দেখা যাচ্ছে যে এত সুবিধা সুযোগ সমেত অতিরিক্ত ভরতুকীতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়ার পরও কাশ্মীর উপত্যকাতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে ও পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠছে। আর এই অপকর্মের পিছনে আছে বর্তমান ইউপিএ সরকারের শরিক পিডিপি-মেহবুবার প্রচ্ছন্ন মদত ও কাশ্মীর উপত্যকায় হুরিয়ত কনফারেন্স নামক বিচ্ছিন্নবাদীদের যৌথ মোর্চা এই তথাকথিত কাশ্মীরিয়তের সমর্থক। তারা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে চিরস্থায়ী এক বিচ্ছিন্নতাবাদী গণ্ডগোল লাগিয়ে রেখে দিয়েছে। তাই হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানী এখন বলতে পারেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের রক্তের সম্পর্ক। তাই গিলানী এখনও রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতা দাবি করে চলেছেন। যাতে কিনা ভারতীয়-কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যস্থতা দাবি আমাদের মাতৃভূমি সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর যুক্ত হবার পরে উঠেছিল যা আজও পাকিস্থানপন্থী নেতা গিলানী সহ অন্যান্যরা তুলছেন। আর এর জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লগ্নে সারা ভারত ৫৬৩টি দেশীয় রাজ্য ছিল এবং একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেকটি রাজ্যকেই আপন কর্মনিপুণতায় তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যটির দায়িত্ব নেহরু স্বয়ং নিজের হতেই রেখেছিলেন। তদানীন্তন কাশ্মীরের মুসলিম নেতা শেখ আবদুল্লার ইচ্ছা পূরণের জন্য নেহরু গোপনে তার সঙ্গে আলোচনা করে ৩০৬ ধারার খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তীকালে ৩৭০ ধারা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ফলতঃ দুই নিশান, দুই বিধান ও দুই প্রধান (এখন নেই) সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ভরতুকীতে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য জ্বালানী দিতে হচ্ছে। তবুও এখনও এত সুযোগ সুবিধা ও ভরতুকীতে মালপত্র পাওয়ার পরেও কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে ভারত ভাগের চক্রান্ত করে গোটা দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীরা একবারও ভেবে দেখছেন না যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতীয় শাসনাধীনে কাশ্মীরীরা কী স্বর্গের সুখ পাচ্ছে! তাই নেহরুর কৃতকর্মের এই কুফলকে হ্রাস করতে গেলে এদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের একটাই দাবি হওয়া উচিত — ৩৭০ ধারা বাতিল করা। ৩৭০ ধারা বাতিল করলে এদেশের অন্যান্য অংশের মতো কাশ্মীরীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জীবনধারণের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করতে হবে। তাতে কাশ্মীরীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করার সময়ও কমে যাবে। তখন গোটা দেশের 'রোটি-কাপড়া-মকান'-এর রাজনৈতিক আন্দোলন হবে। গোটা দেশে এক নিশান এক বিধান এক প্রধানের শাসন এলে পাকিস্তানী পতাকা কাশ্মীরে তোলা বন্ধ হবে। দেশে সুস্থিতি আনতে গেলে গণতন্ত্রের নাগরিকদের কর্তব্যবোধ আসবে কড়া শাসনে, তোষণে নয়। এটা যত তাড়াতাড়ি এদেশের শাসক-শ্রেণী বুঝতে পারবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলজনক হবে।

কাশ্মীরে সঙ্ঘর্ষ ঃ মৃত কেরলের মুসলমান যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কয়েকটি সংগঠন রাজ্যের মুসলমান যুবকদের সন্ত্রাসবাদে যোগ দিতে মগজ-ধোলাই করে সফল হচ্ছে — এই মন্তব্য করেছেন কেরলের পিত্রানগোডে আবু বকর। কেরলের কোজিকোড়ের একটি ইসলামি যুব সংস্থা 'মুন্নী যুব জনসংযম'-এর কার্যকরী সম্পাদক পিত্রানগোড়ে আবু বকর। গত ৭ ও ১০ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর-এর কুপওয়ারা জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে চারজন জেহাদি মারা পড়ে। কেরল রাজ্য পুলিশ ওই চারজনের দুজনকে কন্নুর জেলার এবং একজন করে মালাপ্পুরম্ ও এরনাকুলম-এর বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছে। তারপরই আবু বকর ওই মন্তব্য করেন। তবে এজন্য মুসলমান নেতারা জেহাদি সংগঠন-এর প্রচার প্রসারকে নয়, রাজনৈতিক নেতাদেরই দায়ী করছেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে একবার কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীদের লন্ডন থেকে টাকা ও ক্যাডার পাঠানোর ঘটনা কাশ্মীর ফেরৎ জেহাদিদের বক্তব্যে জানা গিয়েছিল। আর এখন এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, সারা ভারতের মুসলমান যুবকরা জেহাদি সংগঠনের টার্গেট।

আবুবকর-এর মন্তব্য হল — রাজনৈতিক নেতারা ইসলামকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। তাঁর কথার সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা আজ সারা পৃথিবীতে ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের হাত ধরে জেহাদ ও সন্ত্রাসের ভারতায়ন-এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়ণ হয়েছে। মুসলমান ভোটের জন্য ভারতের সেকুলার নেতারা তা দেখেও দেখেন না। জামাত-এ-ইসলামির কেরল রাজ্য সম্পাদক এম কে মহম্মদ আলি'র বক্তব্য হল — সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের রমরমা সন্ত্রাসবাদের তত্ত্বকে দীর্ঘায়িত ও প্রসারিত করছে। তিনি আরও বলেছেন, কাশ্মীরে নিহত ওই কেরলীয় যুবকদের অপরাধমূলক পৃষ্ঠভূমি ছিল। সেজন্যই তারা সহজেই সন্ত্রাসবাদের খাতায় নাম লিখিয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নিয়ন মুসলিম লীগ-এর মতে, এটা খুবই চিন্তার যে, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের জন্য কেরালা থেকেও সন্ত্রাসী যাচ্ছে। একথা কেরলের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা আই ইউ এম এল-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ বসির-এর। তিনি আবার এজন্য কেরলের বামপন্থীদের দায়ী করেছেন। তার কথায় — বামপন্থীরা লীগকে দুর্বল করার ফলেই এরকমটা হতে পেরেছে। যে যাই বলুক না কেন — কাশ্মীরের সন্ত্রাস-এর সঙ্গে দক্ষিণের মুসলমানদের যোগসূত্র বেরিয়ে পড়ায় ধামাচাপা দেওয়ার অকারণ ব্যর্থ চেষ্টা চলছে।

দিল্লী নির্বাচন ঃ অ্যাডভান্টেজ বিজেপি

বিজয় কুমার মালহোত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দিল্লী বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে আগামী ২৯ নভেম্বর। কিন্তু ইতিমধ্যে যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। সবক্ষেত্রে ব্যর্থ শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসী রাজ্য সরকার। তার উপরে যোগ হয়েছে বোমা বিস্ফোরণ এবং জামিয়ানগরে নিহত সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর উথলে ওঠা দরদ। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরাই তো প্রকৃত মানব সম্পদ। যাই হোক বর্তমান সার্বিক গতিপ্রকৃতি কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিরই অনুকূলে বলা যায়। এছাড়া কংগ্রেস দল এখনও অবধি ব্যর্থ, মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের জায়গায় কাকে বদল করবে সেটাও স্থির করে ওঠতে পারেনি। ওদিকে বিজেপি কিন্তু অনেক আগেই নিষ্কলঙ্ক বেদাগ দীর্ঘদিনের সাংসদ-প্রবীণ জননায়ক ও নেতা প্রফেসর বিজয় কুমার মালহোত্রাকে তাদের দলের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী বলে ঘোষণা করে বাজিমাৎ করেছে। বিজয় কুমার মালহোত্রা এত প্রবীণ পোড় খাওয়া ও ক্লীন যে তিনি দলের সবার কাছেই সমান গ্রহণযোগ্য।

তবে এবার দিল্লী বিধানসভা নির্বাচনে মূল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ও বিজেপি বাদে লোকজনশক্তি পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং সমাজবাদী পার্টি ও নির্বাচনী আসরে নামছে। এদের মধ্যে লালুপ্রসাদ-এর রা জ দ এবং রামবিলাসের লো জ পা কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের শরিক। আবার মুলায়ম-অমর সিং-এর সমাজবাদী পার্টি এবং বহিনজীর বহুজন সমাজবাদী পার্টির দৌলতে বামেদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে লোকসভায় আস্থাভোট জিতেছে। সেক্ষেত্রে তারা সবাই কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রতিদান হিসেবে দু'একটা আসন চাইতেই পারে। কংগ্রেস তখন উভয় সংকটে পড়বে। দলের মধ্যেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বা এক আসনে একাধিক দাবিদার রয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে যে, লালু-মুলায়ম-পাসোয়ানরা মোর্চা গড়ে দিল্লীর নির্বাচনী লড়াইয়ে নামবেন।

মালহোত্রার কয়েক দশকের দিল্লীর রাজনীতির অভিজ্ঞতা বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। ওদিকে কংগ্রেস এখন তাঁদের ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণার জন্য দশ নং জনপথের অন্তরাত্মার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শীলা দীক্ষিত দশ বছর লাগাতার ক্ষমতায় থাকার কারণে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হওয়া, তাঁর নিজের কিছু বক্তব্যের কারণে বিবাদও বড় বাধা। দিল্লীতে বিদ্যুৎ, জল, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, সীলিং (তালাবন্ধ) প্রভৃতি বিষয় নির্বাচনে প্রধান ইস্যু। এছাড়া দিল্লীর কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেই কংগ্রেস রয়েছে। সেজন্য দায়ভার নেওয়া থেকে তারা পার পেতে পারে না। কংগ্রেসী কুশাসনে দিল্লীর প্রায় দু'কোটি মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। বিজেপি উপরোক্ত যাবতীয় অব্যবস্থা থেকে দিল্লীবাসীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মা কালীর বিগ্রহ ভাঙ্গল মুসলিম দুষ্কৃতীরা

সংবাদদাতা ।। ৩ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার চকপরাণ কাটাখালি গ্রামের স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক ও কিছু মুসলিম দুস্কৃতী গ্রামের কালী মন্দিরের উপর অর্তকিতে হামলা করে। দুস্কৃতীরা মা কালীর বিগ্রহটি ভেঙ্গে রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। পূর্ব পরিকল্পিত এই হামলার নেতৃত্ব দেয় রাজনৈতিক দলের মদত পুষ্ট বাবলু শেখ ওরফে মাফিজুল ও নিজাম সেখ নামে দুই মুসলিম গুন্ডা। ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দুরা বাধা দিতে গেলে দুস্কৃতীরা তাদেরকেও প্রচণ্ড মারধর করে। শুধু তাই নয়, এই তান্ডবলীলার পাশাপাশি তৃণমূলের মদত পুষ্ট মুসলিম দুস্কৃতীরা গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। এমনকী দুই যুবতীর শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করে। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজনৈতিক ও মুসলিম স্বার্থের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটি ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

হিন্দুদের কণ্ঠরোধের জন্য পুলিশ তাদের বেশ কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যায় ও বাকীদের জেলে পুরে দেওয়ার ভয় দেখায়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি-এর যুব মোর্চার জেলা শাখা চন্দন কানু'র নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে যুব মোর্চা দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে।

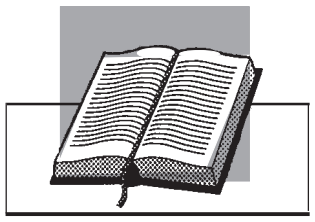

পুস্তক প্রসঙ্গ

হিন্দুরা কি বিলুপ্তির পথে ?

সাধনানন্দ মিশ্র

ভারতে অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়েছিল ১১৯৩ খৃস্টাব্দের সেই দিন, যেদিন কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তার জামাতা দিল্লীর হিন্দু সম্রাট বীর পৃথ্বীরাজ চৌহান মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ঘোরীর হাতে তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। দিল্লী দখল করে মহম্মদ ঘোরী তার পূর্ব আক্রমণকারীদের — মহম্মদ বিন্ কাশেম, সুবক্তগীন, সুলতান মামুদের পথানুসরণ করে হিন্দুদের রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল হিন্দুস্থানের মাটিকে। ঘোরীর পরবর্তীকালে ভারতে এসেছিল মুসলমান খিল্‌জীবংশ, তুঘলকবংশ, লোদীবংশ, মোগল— বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরংজেব তৈমুরলঙ্গ, নাদিরশাহ, আহমদ শাহ আবদালী প্রভৃতি নৃশংস আক্রমণকারীরা। এরা যে কত হিন্দু হত্যা করেছিল, কত হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিল, কত হিন্দুনারী লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যা করেছিল, কত মঠ-মন্দির ধ্বংস করে কত ধন সম্পদ যে লুণ্ঠন করেছিল তার কোনও ইয়ত্তা নেই। এই সব অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী বড় ঐতিহাসিকরা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভারতবর্ষে মুসলমানরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তা তাদের পক্ষে সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। হিন্দুদের কাছ থেকে প্রবল বাধা পেয়ে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের। রানা প্রতাপ সিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, বীর বান্দা বৈরাগী, ছত্রশাল বুন্দেলা প্রভৃতি হিন্দু বীরগণ মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশাল মুসলমান বাহিনীর কাছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। পরাজিত হিন্দুকে তরবারির মুখে হত্যা করা হয়েছিল। কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। হিন্দু নারী ও মঠ-মন্দির প্রাসাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছিল। যারা প্রচার করে ইসলামের অর্থ 'শান্তি', তারা যে কত বড় মিথ্যাচারী ও ভন্ড, ইতিহাসের এইসব রক্তাক্ত ঘটনাবলীই তার প্রমাণ।

ইংরেজ রাজত্বের ২০০ বছর শাসনকালের মধ্যেও মুসলমানরা হিন্দু ও ভারত বিরোধী কাজকর্ম ইংরেজদের মদতে ও উস্কানিতে ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়ায় এবং কংগ্রেসের মুসলিম তোষণনীতির ফলে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত তিন ভাগে বিভক্ত হল — পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান ও ভারত। পাকিস্তানে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হল। ইতিপূর্বে ৮১২ খৃস্টাব্দে প্রাচীন ভারতেরই অংশ গান্ধার রাজ্য (বর্তমানে আফগানিস্তান) মুসলমানদের দখলে এসে গিয়েছিল। পরে বৃটিশ আমলে ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ও সিংহল (শ্রীলঙ্কা) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। দুটি পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পর ভারতের আয়তন আরও ছোট হয়ে গেল। খণ্ডিত ভারতের নাম হলো 'India that is Bharat'। খণ্ডিত ভারতই হলো বর্তমানে হিন্দুদের পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, পুণ্যভূমি। ভারত কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্র হল না। ভারত বিভাজনকারী কংগ্রেস নেতা জহরলাল নেহরুর ষড়যন্ত্রে তা'হলো 'ধর্মনিরপেক্ষ' অর্থাৎ ধর্মহীন রাষ্ট্র।

ইসলাম ধর্ম অনুসারে যে রাষ্ট্রগুলি মুসলিম শাসিত, সেগুলি হলো

'দার-উল-ইসলাম' — আর যেগুলি মুসলিম শাসিত নয়, অ-মুসলমান বা কোরানে অবিশ্বাসী কাফের (হিন্দু) দ্বারা শাসিত সেগুলির নাম 'দার উল হারব'। এই 'দার-উল-হারব'কে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করাই ইসলাম ধর্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত না করা পর্যন্ত, তাদের কাজ থেমে থাকবে না। চলতেই থাকবে। ইসলামশক্তি তাদের 'জেহাদে'র মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিধর্মী (হিন্দু) হত্যা, নারীধর্ষণ, সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্মান্তরণ, অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশেষতঃ ভারতে মুসলমানরা দ্রুতবেগে তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। অর্দ্ধেক ভারত ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের কবলে চলে গেছে। বাকি খণ্ডিত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতকে কব্জা করার জন্য ভারতের মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের সাহায্য নিচ্ছে। ভারত এখন বাইরে ও ভিতরে মুসলমান ও তাদের সহায়ক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত।

হিন্দুদের মধ্য থেকেই এই সহায়ক শক্তির উত্থান হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই খিলাফৎ আন্দোলন ও মুসলিম তোষণনীতির অনুসরণের ফলে কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট ও সেকুলারিস্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারত বিভাগের পথ পরিষ্কার করেছিল। এই সব রাজনৈতিক দল মুখে এক জাতীয়তার কথা বললেও কার্যত জিন্না সাহেবের 'দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে এই স্বাধীন ভারতেও গত ৬০ বছর ধরে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের তোষণ করে দেশ শাসনের নামে দেশদ্রোহিতার কাজ করে চলেছে। ইতিহাসে কয়েকজন মাত্র বিশ্বাসঘাতকের নাম পাওয়া যায়। এখন উপরোক্ত রাজনীতিক নেতারা হাজারে হাজারে লাখে লাখে ভারতরাষ্ট্র -বিরোধী মুসলমানদের ও খৃস্টানদের নানারূপ উপঢৌকন, সুযোগ-সুবিধা, সংরক্ষণ প্রভৃতি দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। খণ্ডিত ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে আনুপাতিক হারে বেড়েই চলেছে। পরপর কয়েকটি জনগণনার রিপোর্টে এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার প্রমাণ রয়েছে। ভারতে জঙ্গি মুসলমানদের হিন্দু ও ভারতবিরোধী কার্যকলাপ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেলেও হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে কোনও জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়নি। গান্ধী নেহরুর নপুংসক মেরুদণ্ডহীন নীতির ফলে হিন্দু আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। হিন্দুরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ এমন কী কাশ্মীর থেকেও বিতাড়িত। হিন্দুদের

(এরপর ৯ পাতায়)

বইপাড়ার খবরাখবর

বর্তমান সমস্যা 'শিল্পায়ন ও কৃষিজমির সংকট ও উত্তরণ' বইটি পাওয়া যাবে পুস্তক বিপণী থেকে। ডঃ আবদুস সামাদ রচিত এই বইটির দাম ৫০ টাকা। বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন ও মুসলমান অনুপ্রবেশ নিয়ে বিমল প্রামাণিকের 'পশ্চিমবঙ্গে অশনি সংকেত' বইটি পাওয়া যাবে মুশায়েরা স্টলে। এই বইটির দাম ১৫০ টাকা। চন্ডী লাহিড়ীর 'স্বাধীনতার পর' বইটির প্রকাশক নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি। বইটির দাম ৮৫ টাকা। দেবব্রত মালাকার সম্পাদিত 'পুন্ড্রবর্দ্ধন' দিনাজপুর জেলার প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে। এই বইটির দাম ১৫০ টাকা। প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর 'সমাজবাদের সমাধি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বইটি পাওয়া যাবে দে বুক স্টোর থেকে। বইটির দাম ২০ টাকা।

শম্ভু মিত্র ১৯৭৭ সালে বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে শান্তি নিকেতনে নাট্য সম্পাদিত যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি ভাষণের মুদ্রিত রূপ 'নাট্যভাষা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে। এই বইটির দাম ১০০ টাকা। ডঃ দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত 'বিশ্ব লোকসংস্কৃতি কোষ' বইটির দাম ৫০০ টাকা। পাওয়া যাবে কলেজ স্ট্রীটের পুস্তক বিপণীতে। অনিরুদ্ধ রায়ের 'মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (১২০০-১৭৫৭) বইটির প্রকাশক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স এবং বইটির দাম ২০০ টাকা।

— ন. ভ.

বুকার জয় ভারতীয়ত্বের রসদে

অয়ন প্রামাণিক।। বলরাম হালুওয়াই, একটা প্রতিবাদের নাম, ভারতভূমিতে চলতে থাকা নিম্নশ্রেণীর জীবন সংগ্রামের একটা সাক্ষী। বলরাম হালুওয়াই অথবা 'The White Tiger' হল একজন ভৃত্য, একজন দার্শনিক, একজন খুনি আবার একজন উদ্যমী ব্যবসায়ী — Entrepreneur। বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষণগড়ের এক রিক্সাচালকের ছেলে থেকে কীভাবে সে একজন মোটরগাড়ি চালক — মোটরগাড়ি চালক থেকে খুনী এবং খুনী থেকে দার্শনিক সুলভ Entrepreneur হয়ে উঠল সেই শক্তি ও সংগ্রামের গল্প অরবিন্দ আদিগা শুনিয়েছেন। ভারতের ঝুলিতে আর একটা বুকার প্রাইজ এনেছেন সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্বের রসদ দিয়ে। সেই বালক বয়েসেই বলরামকে নিজের প্রাথমিক স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে চায়ের দোকানে এঁটো কাপ ধুতে, কয়লা ভাঙতে ঢুকতে হয়েছিল। সে এক অন্ধকার জগৎ। তারপর পালানোর চিন্তা মাথায় দানা বাঁধে। ৩০০ টাকা দিয়ে মোটরগাড়ি চালানো শেখে, শ্রীযুক্ত অশোকের ভৃত্য ও গাড়িচালক হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রীকে লিখছে এই গল্প Entrepreneur বলরাম তার নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে — 'The White Tiger'/ A Thinking man and an entrepreneur / Living in the World's centre of technology and outsourcing electronics city, Phase 1 (just off Hosur Main Road), Bangalore-India (দি হোয়াইট টাইগার' / একজন চিন্তাশীল মানুষ এবং একজন Entreprenour। বসবাস করি পৃথিবীর প্রযুক্তি বিদ্যার কেন্দ্রনগরী ব্যাঙ্গালোরে) এখানেও ভারতীয়ত্বের বৈভব। বলরাম সত্যিই ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর অবহেলিত জীবনকে একটা শক্তি যুগিয়েছে তার গল্পের মধ্যে দিয়ে। একজন দারিদ্র্য-পীড়িত রিক্সাচালকের সন্তান থেকে এক বিজ্ঞ ভারতীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব হওয়ার গল্প বলতে গিয়ে লেখক যেমন ভারতের

আলো, রাস্তা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে এক অন্ধকার দিক তুলে ধরেছেন — যেখানে শুধু অন্যায় আর অবিচার, তেমনই সেখান থেকে উত্তরণের তিনি আলোর পথও দেখিয়েছেন। এখানে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার উজ্জ্বলভাবে প্রজ্জ্বলিত। তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রীকে শুনিয়েছেন তার গল্প। কারণ, স্বাধীনতা-প্রেমী জাতি চীনারা ভারতের ব্যবসায়িক চাতুর্যের গল্পে আগ্রহী। বলরাম প্রয়োজনে নিজের ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করেছেন। বলেছেন — আমেরিকার ওই নকল করা ব্যবসায়ী ম্যাগাজিন নৈব নৈব চ। ওসব নীতি কথা আমাদের ভারতীয়দের কাছে 'Don't waste your money on those American books. They're so yesterday " I am tomorrow"।

সেই মোটরগাড়ি চালকের গ্রামের নদীর ধারে কালো দুর্গ জয় ও সেখান থেকে সংগ্রামের নতুন মোড়। সে খুনী, খুন করেছে তার মনিবকে। অনুতপ্ত হয়ে দার্শনিক। জীবনবোধ ও সংগ্রামকে এক সাথে কাজে লাগিয়ে পরিণত Entrepreneur বলরাম হালুওয়াই বলেছেন একজন গরীবের গল্প, তার বুকের ওপর লেখা এক ধারালো কলম দিয়ে। (''The story of a poor man's life is written on his body, in a sharp pen'')

আর তাই ৩৪ বছর বয়সী অরবিন্দ আদিগার কলমের ধার ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতির কঠোর পরিশ্রমের ইতিহাসে শাণিত হয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থকারদের (বিশেষত ঔপন্যাসিক) পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। চেন্নাই-তে জন্ম নেওয়া, মাঙ্গালোরে বড় হওয়া, দিল্লীকে নিয়ে লেখা, এবং মুম্বাইতে বসবাসরত বৃটিশ 'টাইম' ম্যাগাজিনের সাংবাদিক অরবিন্দ আদিগা যাদের হারিয়েছেন এই প্রতিযোগিতায় তাঁদের মধ্যে কলকাতার অমিতাভ ঘোষ (Sea of Poppies) ও অন্যান্যরা রয়েছেন। এর আগে ভারত থেকে অরুন্ধতী রায়, কিরণ দেশাই প্রমুখরা এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। সর্বোপরি আদিগা তাঁর প্রথম উপন্যাসেই এই পুরস্কারে ভূষিত হয়ে ভারতের মাটির ঐতিহ্যকে পৃথিবীর দরবার পৌঁছে দিলেন।

The White Tiger–
Aravind Adiga

শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়।। একদা রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি, মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে — পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজ, সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে"। বস্তুতঃ "এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা" আমাদের দেশকে দেখলে যথার্থ ভারতবর্ষ দেখা হয় না। কারণ "ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না।" কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে, কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই, ঘরের বাহিরে"। 'সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না ....কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনও ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? এখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতে ছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতে ছিল, তাহার বিবরণ "সমৃদ্ধ ইতিহাস" অমৃত তরঙ্গ সঙ্গমে। "বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে।" এই শিকড়ের উৎসই সন্ধান করে পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন গ্রন্থকার ভাস্কর ভট্টাচার্য। পেশায় আইনজীবী হওয়ায় একটি বিষয়ে তিনি কোনও আপস করেননি — তাঁর প্রত্যেকটি তথ্য প্রমাণ সমেত। নিছক অনুমান বা ভাবাবেগ এই বইতে কোন স্থান পায়নি। বিষয় বৈচিত্রেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ।

(এরপর ৯ পাতায়)

আমেরিকার আর্থিক বিপর্যয়
কিভাবে দুর্ভোগে ফেলছে আমাদের

গৌতম রায় বর্মণ

ভারতের অর্থনীতির উপর সংকটের মেঘ এসে জড়ো হতে শুরু করেছে। বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার দুর্ভোগ, এখন ভাল মতোই ভুগতে হবে ভারতকে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং শিল্প বাণিজ্যমহলও একমত যে, মন্দার যন্ত্রণায় ভুগতে হবে আমাদেরকেও। এমনিতে ইদানীংকালে বিকাশের হারে ভাঁটার টান পরিলক্ষিত হচ্ছিল। মুদ্রাস্ফীতির হার দুই অঙ্কে আটকে আছে। কিছুতেই নামানো যাচ্ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারের ঝুলি ছোট হয়ে আসছিল। টাকার দাম কম ছিল। সেনসেক্স আর আগের মতো লাফাচ্ছে না। ভারতীয় অর্থনীতির এই ডামাডোলের সাথে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির আর্থিক দুরবস্থার একটা যোগাযোগ ছিল। পশ্চিমের দেশগুলির অর্থনৈতিক দুর্ভোগের জেরে ভারতীয় অর্থনীতির হালচালও খারাপ হয়ে পড়ছিল। এর সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে আমেরিকার অর্থের বাজারের অতি সাম্প্রতিক কালের বিপর্যয়। বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে ভয়াবহ আর্থিক মন্দার ধাক্কায় ইতিমধ্যে বিপর্যস্ত আমেরিকাসহ পশ্চিমের দেশগুলির একটা বড় অংশ।

ধাক্কার জেরে কাঁপন ধরেছে ভারতীয় অর্থনীতিতেও। প্রথম ধাক্কাটা এসে লেগেছে শেয়ার বাজারে।রীতিমতো টালমাটাল অবস্থা বাজারের। ধসের জেরে এক ধাক্কায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সেনসেক্স। এখনও সেভাবে আটকানো সম্ভব হয়নি সেনসেক্সের পতনকে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কয়েকদিন একাধিক ব্যবস্থা নিলেও পরিস্থিতি মোটেই বদলায়নি। বাজার থেকে এক নাগাড়ে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ (Foreign Institutional Investment বা সংক্ষেপে এফ আই আই) তুলে নিতে থাকায় তলিয়ে যাচ্ছে বাজার। এই পতন কোথায় গিয়ে থামবে তা ভেবে কূল করতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। আতঙ্কের বাজারে কেউ আর নতুন করে বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। তাই বাজারে এখন আর কোনও ক্রেতা নেই। বিক্রেতারা হুড়োহুড়ি করে বিক্রি করে দিচ্ছেন শেয়ার। বাজারের নিয়মেই দাম পড়ছে শেয়ারের। বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্থানের চিত্র উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

২০০৭-০৮-এর অর্থ বছরে অর্থের বাজারে এই আই আই-এর নিট অনুপ্রবেশের অঙ্ক ছিল ২০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর এই বছরের প্রথম নয় মাসে ১১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ এফ আই আই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮.৩ বিলিয়ন ডলার উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে চালু অর্থ বছরের প্রথম সাড়ে ছয় মাসের মধ্যে। আর বাকিটা ওঠানো হয়েছে ইদানীংকালে। আর্থিক বাজারের বিনিয়োগকৃত এই ফাটকা পুঁজি যখন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা উঠিয়ে নিতে চায় তখন তারা এখনকার শেয়ার বিক্রি করে দেয়। বিনিময়ে টাকা পায়। কিন্তু ভারতের টাকা তারা তাদের দেশে নিয়ে গিয়ে কী করবে? টাকার বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ডলার সংগ্রহ করে তারা নিজের দেশে নিয়ে যান। সবাই একসাথে ডলার সংগ্রহ করতে শুরু করে। এরফলে হঠাৎ করে বাজারে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে। তাই টাকার সাপেক্ষ ডলারের দাম বাড়তে থাকে। ঢালাও হারে ডলারের প্রস্থানের কারণে দেশে নগদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আর্থিক বাজারে ক্যাপিটাল আজ ফিনান্সরূপে যে পুঁজি খাটছিল সেটা কমে যায়। পরিণতিতে আর্থিক লেনদেন কমতে থাকে।

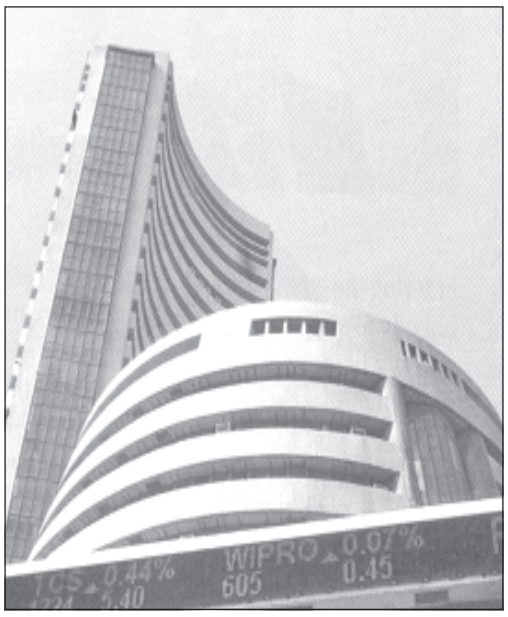

টাকার সাপেক্ষে ডলারের দাম বাড়তে থাকার অর্থ হল টাকার দাম কমতে থাকা। বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়লে দেশে ডলারের আগমন বাড়ে। সঙ্গে বাড়ে টাকার দাম। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই কারণে টাকা বেড়ে চলছিল। এখন উল্টো প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেশ ছেড়ে ডলার পালাচ্ছে। ফলে ডলারের তুলনায় টাকার দাম পড়তে শুরু করেছে। এখন বিশ্ব বাজারে ডলারের সেই আগের দাপট নেই। অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে। ইউরো-ইয়েনের সাথে প্রতিযোগিতায় ক্রমেই পিছু হটছে। গত কয়েক সপ্তাহে এই দুর্বল ডলারের তুলনায় টাকার দাম প্রায় পঁচিশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ বছরের জানুয়ারি মাসে এক ডলার সমান ৩৯.২০ টাকা ছিল। অক্টোবর মাসের শেষের সেটা পঞ্চাশ টাকার গণ্ডি অতিক্রম করেছে।

টাকার দাম কমলে অর্থনীতিতে একাধিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। রপ্তানিকারক সংস্থাগুলির কাছে টাকার দাম কমে যাওয়াটা আশীর্বাদ হিসাবে দেখা দেয়। টাকার অঙ্কে রপ্তানি আয় বাড়ে। এরফলে দেশ লাভবান হয়। কিন্তু এখন এই লাভের গুড়েও বালি ছড়ানো আছে। বিশ্ববাজারে এখন যে মন্দা চলছে এরমধ্যে রপ্তানি যে আহামরি বেড়ে যাবে এমন সম্ভাবনাও কম। অপরদিকে টাকার দাম কমলে, বিদেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানি খরচ বেড়ে যায়। তেল থেকে শুরু করে গম পর্যন্ত অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আমাদের বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয়। আমদানির উপর নির্ভরতা এখনও কমেনি। টাকার দাম কমলে, প্রতিটি আমদানির জন্য আমাদেরকে আরও বেশি পরিমাণে রপ্তানি করতে হবে। কিন্তু কীভাবে করবেন? বিশ্ববাজারে মন্দার কারণে বিক্রি-বাটা আরও কমে গেছে। তাই বলা যায়, টাকার দাম কমে যাওয়ায় আমদানি দাম বেড়ে যাবে এবং বাড়বে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি। সমগ্র অর্থনীতির পক্ষে এর প্রভাব মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে। বৈদেশিক মুদ্রায় যে দেনা সরকারকে মেটাতে হবে তার জন্যও সরকারের কোষাগার থেকে বেশি অর্থ বের হয়ে যাবে। মুদ্রাস্ফীতি-দৈত্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এগুলি হল টাকার মূল্য পতনের তাৎক্ষণিক ফল। আমেরিকার আর্থিক ক্ষেত্রের এই সঙ্কটের জেরে, ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির নগদ যোগানে টান পড়ায় বাজারে টাকার যোগান কমছে। শুধু ব্যাঙ্ক নয়, ছোট বড় লগ্নিকারী সংস্থাগুলির অবস্থাও মোটেই ভাল নয়। মোটা টাকা আটকে গেছে এদের। মূলধন সরবরাহ করে এদের বাঁচানোর প্রচেষ্টা নিয়েছে সরকার। ব্যাঙ্কগুলির নগদ অর্থে টান পড়ায় তাদের ঋণ সৃজনের ক্ষমতা অনেকটা লোপ পেয়েছে। ফলে গাড়ি, বাড়ির ন্যায় যে পণ্যগুলি প্রধানত ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে কেনা হয় — সেগুলির বিক্রিবাটা মার খেয়েছে। জমি বাড়ির বাজারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অটোমোবাইল ও রিটেল ক্রেডিট হ্রাস পাওয়ায়-এই ক্ষেত্রগুলির একই হাল হতে চলেছে। নিকট অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আর্থিক বিকাশের উচ্চহার ধরে রাখতে ক্রেডিট ফিনান্সড হাউজিং বিনিয়োগ ও ক্রেডিট ফিনান্সড কমান্ডস্ ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই ক্ষেত্রগুলিতে নগদের যোগান কমে গেলে, আর্থিক বিকাশের গতি মন্থর হয়ে পড়বে। অর্থাৎ জি ডি পি-র বৃদ্ধির হার কমে যাবে। ইদানীংকালের সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শিল্প উৎপাদন সূচক অনেকটা নীচে নেমে গেছে। শিল্পক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের সংকোচন ঘটল সেটা আরোও কমবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রের এই অধোগতির প্রভাব পড়বে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের উপর। মন্দার প্রকোপ বাড়লে কাজ হারাবে অনেক কর্মী। জীবন জীবিকায় টান পড়বে সাধারণ মানুষের।

হিন্দুরা কি বিলুপ্তির পথে?

(৮ পাতার পর)

একমাত্র দেশ ভারতবর্ষ আজ ভেতরে ও বাইরে শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। তীব্র জাতীয় চেতনা জাগ্রত না হলে হিন্দুদের শীঘ্রই মহতী বিনষ্টি ঘটবে; ভারত থেকে হিন্দু বিলুপ্ত হয়ে যাবে, ভারতে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলমান রাজত্ব। এর জন্য মুসলমানদের কোনও যুদ্ধ করতে হবে না। হিন্দু রাজনীতিক নেতারা যেন ভারতকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এই ইঙ্গিতই বহন করছে।

কীভাবে হিন্দুর বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে, লেখক ফা হিয়েন তাঁর 'বিলুপ্তির পথে হিন্দু' গ্রন্থে বিশদভাবে তথ্য সম্বলিত আলোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে লেখক ফা হিয়েন (ছদ্মনাম) হিন্দু জাতির প্রকৃত ইতিহাস ও তার বর্তমান অবস্থা ও ভারতের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন — "পৃথিবীতে ভারতই একমাত্র দেশ একবার এক ধর্মান্ধ, বর্বর নিষ্ঠুর জাতির দ্বারা বিজিত হওয়ার পর তেরোশত বৎসরের মধ্যে আর মাথা তুলতে পারেনি। বিশাল আয়তনের এই দেশ, বিপুল সম্পদের অধিকারী এই দেশ, মানব সভ্যতার বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারের সংস্কৃতির অবদানে সমৃদ্ধ এই দেশ বর্তমানে শ্মশানযাত্রী মুমূর্ষু জাতির দেশে, এক মেরুদণ্ডহীন নপুংসক প্রজাতির দেশে পরিণত হয়েছে। ভারতের আয়তন কমতে কমতে মানে মুসলিম অধিকারে ও শাসনে যেতে যেতে মুসলিম অভিযানের ১৩০০ বছর পরে যেটুকুতে এসে ঠেকেছে — তাও আগামী দিনে মুসলিম শাসনে চলে যাওয়ার দিকে ধাবমান। কীভাবে যাবে — তা আমি এই পুস্তকে বিশ্লেষণ করেছি। ভারতের এই দুর্গতির কারণগুলি তিনি বর্ণনা করেছেন হিন্দুত্ব ও জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্রন্থটির সূচীপত্র দেখলেই এ বিষয়ে সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে। যথা : — বিপন্ন হিন্দু, হিন্দুর দুর্নীতি, বাঙ্গালী হিন্দুর বিলুপ্তি, ভারতকে ইসলামীকরণ (প্রথম খণ্ড), বিশ শতকে পাকিস্তান, ভারতকে ইসলামীকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), একুশ শতকে ইসলামস্থান, মন্দির-মসজিদ, স্বাধীনতার প্যারাডক্স, পাদটিকার নির্ঘন্ট। পরিশিষ্টের মধ্যে রয়েছে — হিন্দু, ইসলাম, খৃস্টান, ধর্মের ধর্মবীজ, আফগানিস্তানে বুদ্ধমূর্ত্তি ধবংস, হজরত মহম্মদের জীবনী, জেহাদ অভিযান ও তাঁর পত্নীদের বিবরণ, হিন্দুরা কেন দেশত্যাগ করছে, আল্লার নির্দেশ, জওহরলাল নেহরুর উত্তরপুরুষের বিবাহ ও ধর্ম। সব শেষে রয়েছে গ্রন্থপঞ্জী।

প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে সেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন, বহু নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশ করেছেন, হিন্দুজাতি ও ভারতবর্ষকে, হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন, যা এর আগে একটিমাত্র পুস্তকের মধ্যে আলোচিত হয়েছে বলে জানা নেই। প্রতিটি দেশপ্রেমী হিন্দুদের কাছে, বিশেষত নতুন প্রজন্মের ছাত্র ও যুবকদের কাছে এই পুস্তকটি একটি অপরিহার্য 'হ্যাণ্ডবুক' হিসাবে থাকা উচিত। নিজে পড়ে অন্যকে পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সুসংগঠিত কার্যকরী চর্চা ও আলোচনার মাধ্যমে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিশেষত ভারতের প্রতি 'ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী' সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেইভাবে হিন্দুকে সংগঠিত হতে হবে। যারা ওপার বাংলা থেকে মুসলমানের গুঁতো খেয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে এখানে 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই', শ্লোগান দিয়ে (যা মুসলমানরা একেবারেই বিশ্বাস করে না) 'সেকুলার' সেজে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ও ক্ষমতার মধুতে আঠার মতো আটকে রয়েছেন, হিন্দু হয়েও ক্রমাগত হিন্দুস্বার্থ ও ভারতবর্ষবিরোধ ও দেশদ্রোহিতার কাজ করে চলেছেন, তাদের ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন 'বিলুপ্তির পথে হিন্দু' গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থটি কিরূপ জনপ্রিয় হয়েছে, প্রথম মুদ্রণের ১০০০ বই নিঃশেষে বিক্রি হয়ে যাওয়াতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক আরও অনেক নতুন তথ্য দিয়ে হিন্দুজাতির এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সত্যকারের বাস্তব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে নতুনভাবে হিন্দু, হিন্দুত্ব ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। প্রকৃত জাতীয়তাবাদ থেকে হিন্দুরা অনেক দূরে সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে জাতপাত, ও দ্বন্দ্বের নোংরা খেলায় মেতেছেন। মুসলমানরা কিন্তু দ্রুতগতিতে তাদের হারানো মুসলিম সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে। লেখকের সতর্কবাণী — "আগামী দিনে ভারতে হিন্দুর বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে। হিমালয় পর্বত ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল কয়েকটি খৃস্টানল্যাণ্ড ও ইসলামস্তানে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। হিন্দু তার সংস্কৃতি জীবনচর্যাসহ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বালিতে ও ফিজি দ্বীপে। ইউরোপ আমেরিকায় বসবাসকারী হিন্দুরা খৃস্টান শ্বেতকায়, শ্বেতকায়া নরনারীকে বিয়ে করে খৃস্টান হয়ে যাচ্ছে, তাদের বর্ণসঙ্কর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির কোনও চিহ্ন থাকবে না। ভারতে এমনি এক খৃস্টান ও বর্ণসঙ্কর খৃস্টান পরিবার বর্তমান বিপর্যস্ত ভারতের শাসন ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর ইসলাম তো 'জেহাদ' চালিয়েই যাচ্ছে"। ভারতের প্রতিবেশী পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে ভারতবিরোধ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে হিন্দু ও ভারতবিরোধী মাওবাদী কম্যুনিস্টরা, যারা নেপালী হিন্দু। নেপাল আর হিন্দুরাষ্ট্র নেই, সেখানেও মুসলমান (বাংলাদেশী) ও পাকিস্তানীদের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠছে, অবশ্যই ভারতবিরোধিতার ভিত্তিতে।

লেখক এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন ভারতবর্ষে গান্ধার রাজ্য (আফগানিস্তান) থেকে বঙ্গদেশে ইসলাম অভিযানে আরম্ভকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ১৩০০ বৎসরে যে কোটি কোটি হিন্দু নিহত হয়েছে, যে কোটি কোটি হিন্দু রমণী ধর্ষিতা-লুণ্ঠিতা-নিহত হয়েছেন, তাঁদের স্মরণে।

'বিলুপ্তির পথে হিন্দু' — লেখক ফা-হিয়েন। (২য় সংস্করণ) প্রকাশক — প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু, পি-৪৭, এল আই টাউনশিপ, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯, পরিবেশক — দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৪০, মূল্য-১৫০.০০ টাকা মাত্র।

শ্রবণ আমার

(৮ পাতার পর)

বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগ, ঐতিহাসিক যুগের সূচনা, সপ্ত সিন্ধু ও পঞ্চ গৌড়, গুপ্ত যুগ, বঙ্গদেশে কনৌজ-আগত ব্রাহ্মণদের চিরস্থায়ী বসবাস সূচনার ইতিবৃত্ত, আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্কার, সেন রাজ বংশের কাহিনী, ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন, শিখ ধর্মের উত্থান, বঙ্গ দেশে যবন শাসনকাল, কৃত্তিবাস ওঝার প্রথম বাংলা রামায়ণ প্রণয়ন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্ত্তন লীলা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন, মুর্শিদকুলি খাঁ ও বাংলার নবাবী আমলা শিবপুরের জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের পরিচয় মন্দিরতলার ভট্টাচার্য পরিবারের কথা— কিছুই বাদ নেই।

গ্রন্থটি তথ্যবহুল। যাঁরা ইতিহাসের আর পাঁচটি গ্রন্থের মতো যুদ্ধের ধারা বিবরণী খুঁজবেন, তাঁরা হতাশ হবেন। অনেকটা পঞ্জিকার আকারে লেখা, তাই তথ্যবহুল হওয়া সত্ত্বেও পৃথুল নয়। যে সকল ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে আগ্রহী "অমৃত তরঙ্গ সঙ্গমে" তাঁদের দিশারী রূপে পথ নির্দেশ করবে।

অমৃত তরঙ্গ সঙ্গমে

প্রাপ্তিস্থান : অপর্ণাবল্লভ মহাদেবের মন্দির। লেখক : ভাস্কর ভট্টাচার্য। ১৫১ শিবপুর রোড। হাওড়া-২, মূল্য : ৫০ টাকা।

সরকারি পরিবহন শিল্প

সারা রাজ্য জুড়ে 'শিল্পায়ন'-এর হাওয়া বইছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে বড় বড় শিল্পপতিরা শিল্প গড়বেন। বেকাররা চাকুরী পাবে, কর্মচারীরা সুখে থাকবে। এই সুখের স্বপ্ন কী শুধু ভবিষ্যতের শিল্পের ক্ষেত্রেই। বর্তমানে সরকার পরিচালিত পরিবহন শিল্পে সি টি সি, সি এস টি সি, ভূতল-উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ বাস শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নয়? পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারেরই অধীনস্থ সংস্থা কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীতে দীর্ঘ ১২/১৩ বছর যাবৎ শত শত কর্মচারীকে ক্যাজুয়াল, কন্ট্রাক্ট বা দৈনিক মজুরিতে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে, যারা বছরের পর বছর স্থায়ী কর্মচারীদের মতই কাজ করে আসছেন। এই সকল কর্মচারীদের শুধু যে কম মজুরিতে কাজ করানো হচ্ছে তাই নয়, এঁদের বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থতা জনিত ছুটি, সরকারি ছুটি, পি এফ, গ্র্যাচুইটি, ই এস আই, কোম্পানীর পোশাক কোনও কিছুই দেওয়া হয় না। প্রতিবাদ করলে হয় ছাঁটাই না হয় বদলি। স্থায়ী কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ শোনার কেউ নেই। তারা অভিযোগ জানালে অসুবিধাজনক জায়গায় বদলি করা হচ্ছে। ট্রাম কন্ডাক্টরদের বেআইনীভাবে বাস-এ ডিউটি দেওয়া হচ্ছে (বাস কন্ডাক্টরী করার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও)।

কর্তৃপক্ষ ই এফ-এর প্রায় ৭০ লক্ষা টাকা আত্মসাৎ করেছে। বিকল্প চিকিৎসার নামে কর্মচারীদের ই এস আই-এর সুবিধা থেকে বঞ্চি ত করা হচ্ছে। পি এফ-এর টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অফিসে (সল্ট লেক)-এ জমা পড়ে না। পি এফ দপ্তরেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সি এস টি সি, এস বি এস টি সি, এন বি এস টি সি, ভূতল পরিবহন নিগম সর্বত্রই একই অবস্থা। ই এস আই বাবদ সি এস টি সি-র প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা এবং ভূতল পরিবহন নিগম-এর প্রায় ২১ লক্ষ টাকা বকেয়া আছে। ভূ-তল পরিবহন নিগম-এর পক্ষ থেকে বে-সরকারি মালিক বা কেম্পানীর কাছে বাসের রুট ভাড়া খাটানো হচ্ছে। ভূ-তল পরিবহন নিগম-এর নামে লেখা বাস চালিয়ে প্রাইভেট বাস মালিকেরা মুনাফা লুটছে। সেইসব বাসের কর্মচারীদের দায়ভার সরকারের নেই। কাজেই তাদের উপর চলছে মধ্যযুগীয় শোষণ।

পরিবহন শিল্পে লোকসানের ধুয়ো তুলে ভরতুকী দেওয়া বন্ধ করা, কর্মী সংকোচন ও ব্যক্তি মালিকের কাছে পরিবহন শিল্পের জমি বেঁচে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। রাজ্যের চতুর্থ বেতন কমিশনের গৃহীত বেশ কিছু সুপারিশ পরিবহন শিল্পে কার্যকর করা হয়নি। এই শিল্পের কর্মচারীদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ণ ও সামাজিক সুরক্ষাকে সুনিশ্চি ত করতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একপ্রস্থ লিখিত প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পঞ্চ ম বেতন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

ভারতের শ্রম আইন, ই এস আই, পি এফ, গ্র্যাচুইটি আইন, মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশ, তথ্য জানার অধিকার আইন কোনও কর্তৃপক্ষই মানছেন না। রাজ্য শ্রমদপ্তর কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ।

স্বপন কুমার দত্ত,কলকাতা-২৭

স্কুলে সরস্বতী পূজা

"স্কুলে নমাজ, সরস্বতী পূজা বন্ধ" শিরোনামে (২৯-৯-০৮) সংবাদের সারসংক্ষেপ এই যে — মুর্শিদাবাদের নওদা থানার ঝাউবোনা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে কিছু মুসলিম ছাত্র স্কুলেই নমাজ পড়ার অনুমতি চাইলে, প্রধান শিক্ষক বলরাম হালদার তা অনুমোদন করায় বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং স্কুল বন্ধ করতে বাধ্য করে (০৬-৯-০৮)। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক দলের একটা মিটিং-এ সমস্যার সমাধানকল্পে সরস্বতী পূজা সমেত সমস্ত রকম ধর্মাচরণ বন্ধের সিদ্ধান্ত হলে, ছাত্ররা আবার প্রতিবাদ জানায়। তাঁদের দাবি যে গত পঁয়ষট্টি বছরের পুজোর পরম্পরা বন্ধ করা চলবে না।

ঘটনাটা শুধু অপ্রত্যাশিত এবং দুর্ভাগ্যজনকই নয়, অবধারিতভাবে একটা সুপরিকল্পিত দুর্যোগের অশনিসঙ্কেত। নানা কারণে বিদ্যালয়ে নমাজ পড়ার দাবি অযৌক্তিক ও দুরভিসন্ধিমূলক। বিদ্যার আলয়রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু মাত্র বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানের আরাধনার স্থল, অর্থাৎ কোনও প্রকৃতির প্রার্থনা বা ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা নয়। এমন কী হিন্দুদেরও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো অচল এখানে, সাধারণ যুক্তিতেই। ওই সমস্ত দেব-দেবী সাক্ষাৎভাবে বিদ্যার নয়, ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের প্রতীক রূপে পূজিত। স্মরণাতীত কাল থেকে এটাই হিন্দুর আধ্যাত্মিক পরম্পরা।

অপরদিকে, ইসলামী তত্ত্বানুসারে আরাধ্য ঐশ্বরিক সত্তা যে আল্লা, তিনি সাক্ষাৎ কোনও অংশ বিশেষ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের, যেমন বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেবতা নন। তাই কোনও সারস্বত চর্চার প্রতিষ্ঠানে আল্লার উপাসনার দাবি অশান্তি সৃষ্টির দ্যোতক মাত্র। কারণ, স্বীকৃত ভাবেই দুটির উপাসনার লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক।

তাছাড়া বিদ্যাচর্চার মাধ্যমে পরা ও অপরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক) জ্ঞানার্জন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাধারণ লক্ষ্য বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাকার বিদ্যার—সাকাররূপে একমাত্র সরস্বতীর পূজাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন অন্য কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পূজা বা উপাসনার দাবি অত্যন্ত অযৌক্তিক। নমাজের দ্বারা সাক্ষাৎ বিদ্যার আরাধনা করা হয় না। তাছাড়া এই সূত্র ধরে বিদ্যালয়কে হিন্দু ও মুসলিমদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজ নিজ পূজা ও উপাসনাস্থল করতে চাইলে প্রকৃত উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে বারোয়ারী ধর্মালয় হয়ে পড়বে। নমাজ পাঠের দাবিদারদের সেই রকম একটা বিপর্যয়ই উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

আরও একটা সমস্যা এই যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে উভয়ের মানসিকতা অনৈক্যের ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতায় সুসম্পর্কিত। হিন্দুর দেবালয় বা অনুরূপ স্থানে নমাজ পাঠে যেমন পবিত্রতার প্রশ্নে অস্বস্তি জাগাবে। বিপরীতক্রমে নমাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে হিন্দুর উপাসনার চিন্তাও সমভাবে অস্বস্তিকর।

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলী।

নট এ ভাই, নট এ পাই

গোপীনাথ দে মহাশয় জানিয়েছেন, (স্বস্তিকা, ১১।৮।০৮), গান্ধীজীর 'এক ভাই বি নেহি দেঙ্গে, এক পাই ভি নেহি দেঙ্গে' — কথাগুলির উল্লেখ হৃষিকেশ শীল প্রণীত 'বিপ্লবী বীর সাভারকর' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। শ্রীদে আরও জানিয়েছেন, কথাগুলি গান্ধীজী "অসহযোগ" আন্দোলনের অংশ হিসাবে বলেছিলেন। ওই প্রসঙ্গে যাবার আগে আমার কথা একটু বলে নিই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমপর্বে, ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের সোভিয়েত রাশিয়া আগে পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিচারে ওই যুদ্ধ ইঙ্গ-জার্মান 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' বলে চিহ্নিত ছিল, এবং ওই যুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধাচরণের অঙ্গ হিসাবে তারা তখন আওয়াজ তুলেছিল — 'না এক ভাই, না এক পাই'। আমি সে সময় ঢাকা, বিক্রমপুরের মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। অস্পষ্ট হলেও মনে পড়ে, বাড়ির বেড়ার গায়ে সেঁটে দেওয়া খবরের কাগজের উপর লেখা ওই শ্লোগান দেখেছি। বলা বাহুল্য, ওই ধরনের পোস্টার কালচার কংগ্রেসের অন্তত সেকালে ছিল না। আমি অবশ্য আমার স্মৃতিকে অকাট্য প্রমাণ বলে দাবি করছি না। এবার ইতিহাসের পাতা উলটে দেখা যাক।

গোপীনাথবাবু যে 'অসহযোগ' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন সেটি 'আইন অমান্য' আন্দোলন ছিল। তার আগে ১৯৪০-এর মার্চে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ওই আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বীকার করে গান্ধীজী তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে বলেছিলেন — "As soldiers, we have to take our orders from the General and obey them iplicitly. His words must be low. I am your general." (দ্রঃ Gandhi : His life and thought-J. B. Kripalani)। ওই আন্দোলন আর শুরু করা হয়নি। 'General' গান্ধী ১ জুন তারিখের 'হরিজন' পত্রিকার মাধ্যমে জানালেন —"We do not seek our independence out of Britains ruin"(দ্রঃ The History and culture of the Indian People, vol-XI 'Struggle for Freedom'-2d R.C. Majumdar)। তার আগে ২০ মে তারিখে এক বিবৃতির মাধ্যমে পন্ডিত নেহরুও অভিমত প্রকাশ করেছিলেন "Launching a Civil Disobedience Compaign at a time when Britain is engaged in a life and death struggle would be an act derogatory of India's honour."—

(ঐ)। অবশেষে ১৯৪০-এর সেপ্টে ম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর পরামর্শ ও পরিচালনায়, ব্রিটিশ পক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি না করে, ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল — "and not wonting to haper the Allies' war effort, decided as advised by Gandhiji, to launch individual civil disobedience. It had to be under his guidance. The issue was limited to one of freedom of speech to express and propagate views on a war into which India had been dragged without its consent and in the conduct of which people had no say"(ওই, কৃপালনী)। অর্থাৎ, যে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের মতামত গ্রাহ্য নয়, সেই চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ সম্পর্কে মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা চাই। ওই প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন — "যখন বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখন গান্ধীজী সীমিত আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ভাবেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, নারী-পুরুষ সবাই ব্যক্তিগতভাবে ভারতকে যুদ্ধ টেনে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। তারা প্রকাশ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করবে এবং গ্রেপ্তার বরণ করবে। আমার মত ছিল আরও ব্যাপক এবং সক্রিয় যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে। কিন্তু গান্ধীজী তাতে সম্মত হন না। তিনি আর এগোতে রাজী ছিলেন না" — (দ্রঃ India Wins Freedom)। গান্ধীজীর 'ডু অর ডাই, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ঘোষণার উল্লেখ আমরা সর্বত্র পাই, কিন্তু, 'এক ভাই বি নেহি দেঙ্গে, এক পাই ভি নেহি দেঙ্গে' জিগির তুলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ গান্ধীজী দিয়েছিলেন তেমন কোনও উল্লেখ মৌলানা আজাদ বা আচার্য কৃপালনীর পুস্তকেও পাওয়া যায় না, যদিও সে সময় তাঁরা যথাক্রমে কংগ্রেস সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে থেকে গান্ধীজীর যাবতীয় আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।

সে যাক, গোপীনাথবাবু'র তথ্য-বিচ্যুতি হয়নি, জানা গেল; কিন্তু ঋষিকেশবাবুর তথ্যের সূত্র কী এবং তা কতটা মজবুত, তা জানা গেল না। তাই, সংশয় রয়ে গেল।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

বসিরহাটে বস্ত্র দান অনুষ্ঠানে বস্ত্রদান করা হচ্ছে।

সমাজ সেবা ভারতী'র নতুন বস্ত্র বিতরণ

সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ৩ থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দুঃস্থ তথা অনাথ বালক-বালিকা এবং তাদের অভিভাবকদের বস্ত্র প্রদান করা হয়।

ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন শিশু সংস্কার কেন্দ্রে মোট ১৯১ জন শিশুকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা সঙ্ঘচালক ঠাকুরদাস অধিকারী, মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক ধনঞ্জয় ঘোষ সহ অনান্য কার্যকতারা। খাগদাতেও ১০ জনকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

সুন্দরবন জেলার পিছাখালিতে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বস্ত্র প্রদান করেন স্থানীয় কার্যকর্তারা। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের প্রান্তকারিণী সদস্য তথা সমাজ সেবা ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ আঢ্য।

ব্যারাকপুর জেলার কর্ণমাধবপুরে ৮ জন বালক-বালিকা এবং ৩১ জন মায়েদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন— সমাজ সেবা ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সহ-সভাপতি সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, স্থানীয় পঞ্চ ায়েত সদস্যা ময়না মন্ডল এবং কার্যকরী সমিতির সদস্য অলোক মুখোপাধ্যায়।

হুগলীর বীরপালা ও মালিপাড়াতে ৪২ জন শিশুর হাতে বস্ত্র তুলে দেন স্থানীয় কার্যকর্তারা, এছাড়াও সিমলাগড়, তাজপুর এবং পাক ড়িতেও ১২০ জনকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

বসিরহাট গীতা ভবনেও এক অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ সেবাভারতীর পাঠ দান কেন্দ্রের ৭ জন শিক্ষক সহ ২৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বস্ত্র দেওয়া হয়।

স্থানীয় বিভাগ প্রচারক বুদ্ধ দেব মণ্ডল, গিরীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে আসানসোলের দুর্গাপুর, বর্ধমানের কাটোয়া, বারকোণা-তে প্রায় ১০০ জনকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। সঙ্ঘের প্রান্ত সহ-সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই স্থানীয় মানুষ ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

শোকসংবাদ

গত ১৪ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের শিবপুর মন্দিরতলা প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক মিলন ব্যানার্জী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্ত্রীসহ তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

হাওড়া কেশব নগর কার্যবাহ সঞ্জিত দে-র মাতৃদেবী বীণাপানি দে গত ২২ অক্টোবর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। চার পুত্র ছয় কন্যা সহ তার নাতি নাতনিরা বর্তমান।

পরম্পরা

ভারতের স্মৃতি সংহিতা

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর

যাহা স্মৃত হয়েছে, তাই স্মৃতি। স্মৃতি পদের অর্থ স্মরণ। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের শাশ্বত সনাতন সত্য সমূহ বৈদিক ঋষিগণ দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ রূপে অলৌকিক সূক্ষ্ম যোগশক্তির সাহায্যে অন্তরে শ্রুত হয়েছিল।

এই নিমিত্ত বেদের নাম 'শ্রুতি'। শ্রুতি হল মূল সিদ্ধ শাস্ত্র-সনাতন। বেদ নিহিত তত্ত্বরাশি সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না। তাই, যুগ পরিবর্তনে সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও, ওইসব বৈদিক তত্ত্ব থাকে অপরিবর্তিত।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা আমাদের জন্য কঠোর বন্ধনের সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে মানুষের জীবনে সুনিয়ন্ত্রণের জন্য, উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য, বৃহত্তম কিছু অর্জনের জন্য, মনুষ্যত্বের চারাগাছটিকে তাঁরা সংযমরূপ বেড়া দিয়ে বৃদ্ধির অনুকূল করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষ্য — ভোগবাদ। আর ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষ্য — ভোগের ভেতর দিয়ে ত্যাগবাদ আর এই জন্মে ঈশ্বরলাভ ও তার জন্য সাধনা। বিশ্বপ্রকৃতির আদিমূল মানুষ এবং মানুষ যে অন্য মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে সংযুক্ত — আমরা যে সবাই এক ও অমৃতের সন্তান — তা প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে স্মার্ত ধর্মের মাধ্যম দিয়ে সংপৃক্ত করে গেছেন।

পরবর্তীকালে আর্য মুনি-ঋষিরা বেদের ওই শাশ্বত সনাতন বাণীর মর্ম অন্তরে স্মরণ করে, তার ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী নিজ নিজ যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন। এই সকল শাস্ত্রই স্মৃতি। এর অর্থ হল, স্মৃতি হল যুগশাস্ত্র। সামাজিক-অবস্থা-সম্বন্ধ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিবর্তন হয়। এগুলি ঋষিদের রচিত ও চিন্তাপ্রসূত, সেই জন্য অপৌরুষেয় নয়। বেদের প্রামাণ্য মুখ্য, এদের প্রামাণ্য গৌণ। কোনও স্মৃতিবাক্য বেদান্ত অনুমোদিত হলে আদৃত হয়। স্মৃতিবাক্য বেদবিরুদ্ধ হলে অনাহুত ও ত্যক্ত হয়।

স্মৃতি শব্দের দুই অর্থ — ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে যে সকল যুগশাস্ত্র বেদবাণীর স্মরণে রচিত, সে সমস্তই বোঝায়। এগুলি যথা ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ও আগম।

স্মৃতির সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবল ধর্মশাস্ত্রকে বোঝায়। ধর্মশাস্ত্রের অপর নাম স্মৃতিসংহিতা। এই ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসংহিতাগুলি কুড়িজন সমাজ ব্যবস্থাপক ঋষিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এঁরা হলেন মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস, উষণা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। এঁরা এঁদের রচিত স্মৃতিসংহিতায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন কালে, দেশের সুশাসন ও আর্য হিন্দুর জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণ ইচ্ছায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। দশবিধ সংস্কার, খাদ্যা-খাদ্যবিচার, ব্রতপূজা, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ, রাজধর্ম, শাসননীতি ইত্যাদি নানা বিষয় বস্তু সমুদায়ে এই স্মৃতি সংহিতাগুলি সমৃদ্ধ। এতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এইসব বিশদভাবে আলোচিত। এইসব স্মৃতি-সংহিতার অনুশাসন যুগ প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। সত্যযুগে মনু-স্মৃতি বা মানবধর্মশাস্ত্র, ত্রেতাযুগে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, দ্বাপর যুগে শঙ্খ ও লিখিতের স্মৃতি, কলিতে পরাশর স্মৃতি প্রচলিত। বিশটি স্মৃতি সংহিতার মধ্যে মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ও পরাশর স্মৃতি-এই তিনটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ।

স্মৃতিকার ঋষিগণ ছিলেন সমাজ-ব্যবস্থাপক, সমাজ বিজ্ঞানী ও আইন প্রণেতা। বর্তমান হিন্দু আইন ছড্রন্তস্তুত্ত ট্রস্সস্তন্দ্ব চন্প্তপ্তগ্ন এই প্রাচীন স্মার্ত ঋষিদের অনুশাসনের উপর অধিষ্ঠিত।

এইসব ঋষিদের মধ্যে মনু শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম আইন প্রণেতা ও মানবসমাজের আদি ব্যবস্থাপক। তাঁর ওপর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি মিথিলারাজ জনকের যজ্ঞে অনেক-গো-ধন পেয়েছিলেন, যাদের শিং সোনায় বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এঁর দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও গার্গী। মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্মজ্ঞা।

পরাশর সেই বিখ্যাত জ্যোতিষবেত্তা ঋষি, যিনি সত্যবতীর গর্ভে মহাঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্মদাতা। ব্যাস বেদবিভাগ কর্তা, মহাভারত ও শ্রীমদ্ ভাগবত রচয়িতা।

কৃতে তু মানবা ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।

দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ।। — পরাশর

ভারতে আর্য-হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে মনু-স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত ও সম্মানিত। বিচারালয়ে হিন্দু আইন সম্বন্ধে কোনও বিতর্কিত কঠিন প্রশ্ন উঠলে প্রধানত মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি থেকে সমাধান খোঁজা হয়।

এই দুটির মধ্যে আবার হিন্দু আইন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসন বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়।

প্রাচীনকালের পর পঞ্চ দশ ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রী রঘুনন্দন নবদ্বীপে ও মিথিলার বাচস্পতি মিশ্র নব্যস্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এখন বাঙালী হিন্দু সমাজে তা প্রচলিত। একটির প্রভাব দক্ষিণবঙ্গে, আর একটির উত্তরবঙ্গে।

রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য পরবর্তী।

স্মৃতি বিহিত নিত্য কর্ম — পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মানুষ সৃষ্টির অংশ মাত্র, সে একা থাকতে পারে না। সে জন্মাবধি অপরের কাছে ঋণী, মানুষ ঋণী দেবতাদের কাছে, কারণ দেবতাদের শক্তি প্রয়োগে বায়ু-তাপ-আলো-বৃষ্টি নিয়মিতভাবে মানুষ পায়, তা না পেলে তার অস্তিত্ব থাকত না।

মানুষ ঋণী পিতৃগণের বা স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদের কাছে। কারণ তাঁদের বংশে মানুষের জন্ম। তাঁদের বংশগৌরবে সে গৌরাবাণ্বিত। মানুষ ঋণী সত্যদ্রষ্টা শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিদের কাছে। কারণ মানুষ শাস্ত্রপাঠে অতীন্দ্রিয় দিব্যজ্ঞান লাভ করে, দিব্যজীবনের অধিকারী হতে পারে। মানুষ ঋণী অপর মানুষের কাছে। কারণ অন্য মানুষের সাহায্য ছাড়া জীবন নির্বাহ করতে পারে না। মানুষ ঋণী অপর প্রাণীর কাছে। মানবেতর প্রাণী গরু, ছাগল, মহিষাদি প্রাণী মানুষকে প্রভূত সাহায্য করে। মানুষের এই পাঁচ রকমের ঋণ — দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, নৃ-ঋণ ও ভূতঋণ। এই ঋণগুলি শোধ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আত্মত্যাগের দ্বারা এই সব ঋণের পরিশোধ হয় বলে এক এক ঋণ পরিশোধকে এক এক যজ্ঞ বলা হয় যথা—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ, এগুলি পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

দেবযজ্ঞ-দেবতারা সূক্ষ্ম লোক অধিবাসী। দেবযজ্ঞ অর্থে তাঁদের নিত্য পূজা আমাদের নিত্য করা উচিত। দেবযজ্ঞে অর্ঘ্যাঞ্জলি ও হোমে মমত্ববোধ ত্যাগে যজ্ঞীয় দ্রব্যের আহুতি দিতে হয়।

পিতৃযজ্ঞ — দুই শ্রেণীর পিতৃপুরুষ এক অমানব ব্রহ্মার মানসজাত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি — এরা সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, সেই হেতু আমাদের পিতৃস্থানীয়। তাঁরা অমানব পুরুষ। তাঁরা সৃষ্টির প্রথমাবধি পিতৃলোক বা ভুর্বলোকের অধীশ্বর রূপে বিরাজমান। তাঁরা প্রথম শ্রেণীর পিতৃপুরুষ। আর দ্বিতীয় শ্রেণী আমাদের মৃত পূর্বপুরষগণ মনুষ্যজাত, তারা স্থূলদেহত্যাগে সূক্ষ্মদেহে পিতৃলোকে যান ও সেখানে বাস করেন। পিতৃ পুরুষগণ সূক্ষ্ম শরীরী ও আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাঁদের স্নেহাশীর্বাদে আমাদের শুভ কামনা সুসিদ্ধ হয়। তাঁদের প্রতি আমাদের জন্মগত ঋণ পরিশোধের জন্য ও তাঁদের কৃপা ও নিত্য আশীর্বাদের লাভার্থে তাঁদের উদ্দেশ্যে হোমে দ্রব্যাহুতি ও অর্ঘ্যাঞ্জলি ইত্যাদি দেবার নাম পিতৃযজ্ঞ। মহালয়ায় ও অন্য সময়ে পিতৃ তর্পণ ও পিতৃযজ্ঞ। পিতৃশ্রাদ্ধ ও একপ্রকার পিতৃতর্পণ, এর দ্বারা পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন।

ঋষি যজ্ঞ — স্বাধ্যায় অর্থাৎ ঋষিরচিত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও সন্ধ্যাবন্দনা — এই দুই কর্ম করলে ঋষি ঋণ পরিশোধ হয়। স্বাধ্যায় ও সন্ধ্যাবন্দনায় আমাদের অন্য কাজ ত্যাগ করে কিছু সময় দিতে হয় — এখানেও কিছুটা আত্মত্যাগের কথা থাকায় একে যজ্ঞ বলে। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সন্ধ্যা বন্দনা ত্রৈকালিক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে তিনবার প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনা করা উচিত। বৈদিক ও স্মার্ত সন্ধ্যাবন্দনায় সামান্য প্রক্রিয়াভেদ আছে। স্মার্তসন্ধ্যায় আচমন, সংকল্প, বিনিয়োগমন্ত্র, প্রাণায়াম, উপস্থান ও গায়ত্রী আছে — প্রতিটির মন্ত্র পাঠ উচিত। ঋগ্বেদের সৃষ্টি রচনা বিষয়ক প্রসিদ্ধ তিনটি মন্ত্র স্মার্তসন্ধ্যায়া আগমন মন্ত্রে গৃহীত। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটিও গায়ত্রী মন্ত্ররূপে গৃহীত। অন্যগুলি পৃথকভাবে রচিত

নৃযজ্ঞ, এতে অতিথি সেবা ও জনসেবা মুখ্য কর্ম। এর অপর নাম অতিথিযজ্ঞ। প্রত্যহ গৃহে অতিথি ভোজনই অতিথি সেবা। ভারতে ঐতিহ্য হিসাবে পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব-র পরেই অতিথিদেবো ভব বলা হয়। গৃহে আগত অতিথিকে ভোজন করিয়ে গৃহস্বামী ভোজন করবেন এই বিধি। জনসেবার অর্থ-আর্ত পীড়িতের সেবা। এর দ্বারা মানুষের কাছে আপনার ঋণের পরিশোধ হয়। এতেও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। তাই, যজ্ঞ।

ভূত-যজ্ঞ — পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, মানবেতর প্রাণীদের সেবা হিন্দু ধর্মের অঙ্গন। আমাদের খাদ্যের কিছু অংশ এদের দেওয়া উচিত, তাই যজ্ঞ।

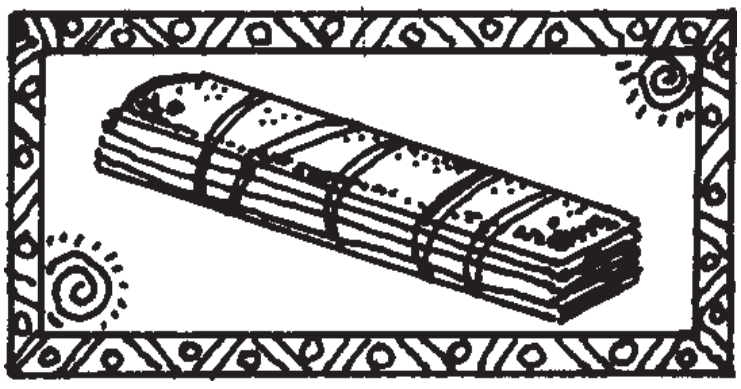

দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞে হোমের আহুতি দিতে হয় সেই কারণে এই যজ্ঞকে বলে ইষ্ট। ইষ্টের মুখ্য অর্থ হোমকর্ম। নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞে পুষ্করিণী (পুকুর) ও কুয়ো (কূপ) খনন ইত্যাদি পূর্তকর্মরূপ দান কর্ম প্রধান, সেই হেতু এই দুই যজ্ঞকে বলা হয় — পূর্ত।

দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এই চারটিকে বলা হয় ইষ্টাপূর্ত।

উপনিষদে পঞ্চ যজ্ঞ সাধনা স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত। এটি বেদসম্মত। তবে স্মৃতির আমলে এটি বিশিষ্ট স্থান পায়।

স্মৃতি বিহিত নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে দশবিধ সংস্কার ও বর্ণবৃত্তি উল্লেখ্য।

স্মৃতিকার ঋষিগণ ষোড়শ সংস্কার হতে দশটি বেছে নেন এগুলি দশবিধ সংস্কার রূপে খ্যাত। যথা — গর্ভাধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। প্রত্যেক সংস্কার মন্ত্রসহ কর্তব্য। এর ভেতর বেদমন্ত্রও কিছু রয়েছে।

স্মৃতির অনুশাসনে সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন গুরু বা আধ্যাত্মিক মন্ত্রদাতা। গুরুর গোত্রে শিষ্যের পরিচয় দান চলত। গোত্রকর্তা ঋষিদের বংশধরের ভেতর যাঁরা খ্যাতনামা, তাঁদের দ্বারা আবার প্রবরের সৃষ্টি। যথা জমদগ্নি গোত্রে জমদগ্নি, ঔর্ব, বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর। শাস্ত্রীয় কর্মে পরিচয়দানের সময় গোত্র ও প্রবর উল্লেখ করতে হয়। বৌধায়ন সূত্রকারের মতে, গোত্রকর্তা ঋষি আটজন মাত্র। ধনঞ্জয়কৃত ধর্মপ্রদীপে মোট আটত্রিশটি গোত্রও প্রত্যেক গোত্রের অন্তর্গত প্রবর উল্লিখিত। এখন ধর্মপ্রদীপ গ্রন্থ প্রচলিত, বৌধায়নীয় গোত্র প্রবর অপ্রচলিত।

সগোত্রে বিবাহের অর্থ - এক বংশে বিবাহ, যা জাতির পক্ষে অনিষ্টকর। এই সিদ্ধান্ত সুপ্রজনন বিদ্যা ছড্রুন্ধদ্ধনন্দ্বদগ্ন এ স্বীকৃত। এই গোত্র প্রথা বা আমরা হিন্দুরা যে ঋষিগণের বংশজাত, আর্যকুলপ্রদীপ তা হিন্দুর বিশিষ্টতা। ঋষিগণ পবিত্রতার আধার।

পবিত্র বংশধারার উৎস যেন তারা। আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ — হিন্দু ঋষির বংশধর এই বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করে। বিবেকানন্দ বলেছেন — গর্ব করে বলো আমি হিন্দু।

বর্ণবৃত্তি — পঠন-পাঠন, যজ্ঞ করা-করানো, দান ও পরিগ্রহ — এই কটি ব্রাহ্মণ বৃত্তি। ক্ষত্রিয়বৃত্তি — দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও সকল বিষয়ে অনাসক্তি, বৈশ্যবৃত্তি — পশুপালন, দান, যজ্ঞ, ব্যবসা, কুসীদ (ঋণ দেওয়া) ও কৃষিকাজ, শূদ্রবৃত্তি — পরিচর্যা, পরিচর্যার দ্বারা সমাজরক্ষণ। স্মৃতিশাস্ত্রে পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কর্মের ব্যবস্থা অনেকরকম — দ্বাদশ দিন ব্যাপী, মাসব্যাপী, গ্রীষ্মকালে চারদিকে আগুন জ্বেলে জপধ্যানাদির অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত — কষ্টসাধ্য শারীরিক ক্লেশদায়ক ব্রতানুসরণ — যার দ্বারা পাপ নাশ বা অশুভ কর্মের নাশ হয়। প্রায়শ্চিত্ত

(এরপর ১২ পাতায়)

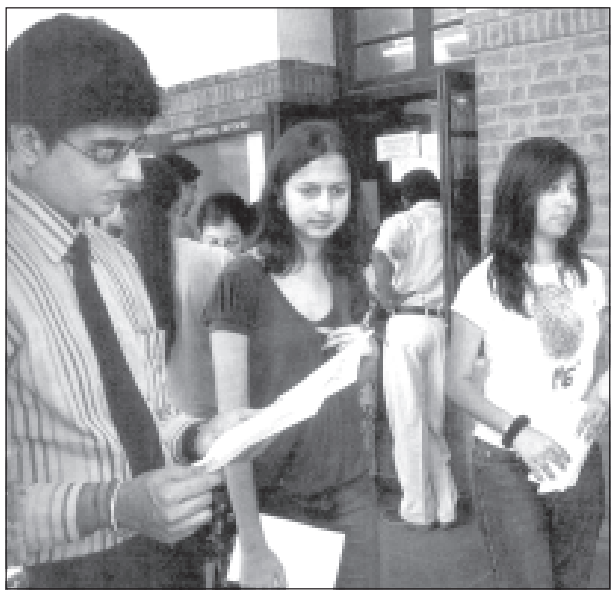

নিয়মের জালে বেঁধো না নারীকে

প্রীতি বসু

মা বললেন মেয়েকে — তুমি মেয়ে, অতো বেরিও না। ভাই ছেলে, সে বেরোতে পারে। সে সারারাত্রি বাইরে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। তুমি সন্ধ্যে নামতে না নামতেই ঘরে না ফিরলে লোকে পাঁচকথা বলবে। আরও বললেন — শোন, আমি তোমার বাবার সাথে সকালবেলায় দিদিমাকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি রান্নাটা করে রেখ। ভাইই বাজার করে এনে দেবে। তুমি যেন খবরদার বাজারে যেও না। পাশের বাড়ির খুড়িমা আমাকেই দু-কথা শুনিয়ে দেবেন। বলবেন মেয়েকে শিক্ষা দিতে পারনি বউমা — ঢ্যাং ঢ্যাং করে বাজারে গেল।

মেয়ে মায়ের এতসব উপদেশ শোনার পর বলে ফেললো — আমার ব্যাপারে এতসব কথা বলছো কেন মা, ভাইয়ের সম্বন্ধে তো কিচ্ছু বলছো না!

মায়ের তপ্ত উত্তর — এই এক মেয়েদের কথা — কেন? প্রশ্ন কেনরে বাবা। বুঝিস না তোরা মেয়ে। তোদের সবসময় সামলে চলতে হবে। কেন-টেন প্রশ্ন করতে নেই। ছেলে-ছেলেই। মেয়ে-মেয়েই। ছেলেদের সাতখুন মাপ, মেয়েদের চৌকাঠ পেরোলেই সাত-সতেরো দোষ। এতো গেল মা-মেয়ের কথা।

বলি প্রতিবেশীদের কথা — এ্যামা বাড়ুজ্যেদের বউটার মেয়ে হলো, ছেলে হলো না!

এবার বলি শহুরে শিক্ষিত দুই বান্ধবীর কথা। জিনিয়া বলল — এই টিউলিপ, তোর মেয়ে হল, আমার বাবা ছেলে।

প্রত্যন্ত গ্রাম নয়, শহরের বুকেই আজকের অত্যাধুনিক যুগে সমাজের বেশির ভাগ ঘরের চালচিত্র। কিন্তু কী করছে না নারী? পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে সবই তো করছে নারীরা। জল-স্থল অন্তরীক্ষ সর্বত্রই তো নারীরা পুরুষের সঙ্গে রয়েছে। কোথাও কোথাও তো নারীই এগিয়ে রয়েছে। আমাদের অর্থাৎ ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ পদেই তো রয়েছেন নারী রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল।

ভারতের সংবিধানে রয়েছে, বিচার স্বয়ং এসে দাঁড়াবে — মণিহারা মানবীর দ্বারে। তাইতো ভারতের আইন ব্যবস্থা নারীকে দিয়েছে ভুরি ভুরি অধিকার। কিন্তু হায় হায় — আজও নারী কাঁদে বিচারের বঞ্চ নার ঘায়ে।

নারীদের পোশাক-আসাক যথা — সালোয়ার কামিজ, বিকিনি প্রভৃতি নিয়ে নানান বিতর্ক। নাজেহাল নারী। কেউ বলবেন সংকীর্ণতা, কেউ বলবেন জাতীয়তাবাদী।

কিন্তু মনে হয় — কেউ নয়। দায়ী বহুদিন ধরে চলে আসা সামাজিক অন্ধ অনুশাসন, পুরুষতান্ত্রিকতার পাল্লা ভারী,

আর অধিকাংশ নারীর তা মেনে নেওয়ার সহনশীলতা বা প্রশ্রয় দেওয়ার আবেগ তথা প্রবণতা।

কিন্তু খোলা চোখে বাস্তবক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলে প্রকৃত পক্ষেই বলা যায় কোনও নিয়মই আজ আর শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য বা নারীদের জন্য নয়। সকল নিয়মই সকল পুরুষ ও সকল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আনন্দময়তা, ভালবাসা, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা সর্বোপরি যা ন্যায়, যা মঙ্গলজনক তাই সকল শিশু-পুত্র-কন্যাকে এই শিক্ষা দিতে হবে। মা-বাবাকে সচেতন হতে হবে — কোনও গুণই, কোনও নিয়মই পুরুষ বা নারীর একচেটিয়া নয়। মেয়েরাও যেমন অর্থনীতিতে পারদর্শী হয়ে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করছে, রোজগার করছে, বাইরের কাজ করছে। তেমনই পুরুষরাও অনেক ক্ষেত্রেই ঘর কন্যা করছে, সংসার রক্ষা করছে, শিশু পালন করছে, আর্তের সেবা করছে।

পরিশেষে গুটিয়ে যাওয়া, ক্রন্দনরত নারীদের বলি, পারছি না, পারছি না করে গুটিয়ে গেলে, কাঁদলেই হবে না। দুধের বাটি মুখের কাছে গেলেই তার স্বাদ পাওয়া যায় না। সেটিকে নিজ হাতে মুখের কাছে তুলে নিলেই তার স্বাদ পাওয়া যাবে। জমি পেলেই ফসল হয় না। মাটি তৈরি করে নিজেদেরই ফসল তুলতে হবে।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। বাইশ

স্মৃতি সংহিতা

(১১ পাতার পর)

নানা প্রকার — কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র,সান্তপণ, চান্দ্রায়ণ, পঞ্চ তপা, কৃচ্ছ্র — ১২ দিনব্যাপী, চান্দ্রায়ণ অমাবস্যায় উপবাস করে ১ মাস ব্যাপী খাদ্যহ্রাস ও দানধ্যান অর্চনা। পঞ্চ তপা — অগ্নিস্থাপন করে সাধনা।

তুষানলে দেহ দগ্ধ করে মৃত্যুর বিধানও ছিল। লঘু পাপকর্মের নাশ গঙ্গাস্নান। অনুতাপই পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধান। নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানও পাপ ক্ষালনার্থ। উদুখল অর্থাৎ ঢেঁকি, যাঁতা, চুল্লী, কলসী ও কাঁটা — এই পঞ্চ হিংসা স্থান জনিত পঞ্চ বিধ পাপের বা পঞ্চ সূনার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞে নিত্যকরণীয়। কার্যক্রম সম্পর্কে স্মৃতি মুখ্যতঃ কতকগুলি হোমের ব্যবস্থা করেছেন — সেগুলি বৈদিক যাগের পরিবর্তিত আকার।

স্মার্তকার ঋষিগণের বিধি নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্তের সুদূর লক্ষ্য ছিল কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, জীবনে মানুষের চিত্তশুদ্ধি-সিদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিই মানবধর্মের আদিকথা। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য-মোক্ষ। চিত্তশুদ্ধি না হলে মোক্ষ লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেইজন্য স্মৃতি সংহিতায় এই সকল বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। এই বিধি নিষেধ মেনে চললে অন্তরে সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণের দ্বারা মানব পশু প্রকৃতি জয় করে দিব্য প্রকৃতি লাভ করতে পারে — দিব্য মানব হতে পারে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা আমাদের জন্য কঠোর বন্ধনের সৃষ্টি করে গেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে মানুষের জীবনে সুনিয়ন্ত্রণের জন্য, উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য পূরণের জন্য, বৃহত্তম কিছু অর্জনের জন্য, মানুষ্যত্বের চারাগাছটিকে তাঁরা সংযমরূপ বেড়া দিয়ে বৃদ্ধির অনুকূল করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষ্য — ভোগবাদ। আর ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষ্য — ভোগের ভেতর দিয়ে ত্যাগবাদ আর এই জন্মে ঈশ্বরলাভ ও তার জন্য সাধনা। বিশ্বপ্রকৃতির আদিমূল মানুষ এবং মানুষ যে অন্য মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে সংযুক্ত — আমরা যে সবাই এক ও অমৃতের সন্তান — তা প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে স্মার্ত ধর্মের মাধ্যম দিয়ে সংপৃক্ত করে গেছেন। তাঁরা আমাদের চির প্রণম্য। তবে আধুনিক যুগের নিরিখে বলা যায়, প্রাচীন সমাজের পরিস্থিতি পালটে গেছে। আজকে কম্পিউটার-রকেটের যুগে এগুলিকে কিছু পরিবর্তনের সময় এসেছে — অবশ্য ঐতিহ্য বজায় রেখে।

প্রয়োজনীয় পড়াশোনা

১। মনুস্মৃতি — আনন্দ সংস্করণ

২। বিশটি স্মৃতিসংহিতা — আর্যশাস্ত্রসংস্করণ

— শ্রী শ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ-মহামিলন মঠ

৩। বেদ — হরফ প্রকাশন

৪। হিন্দুধর্ম — রমেশচন্দ্র দত্ত।

সি পি এম বিরোধী জোট এবং গণ-আন্দোলনই একমাত্র পথ, বিকল্প পথ নেই

অমলেশ মিশ্র

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক অপরিণততা এবং আত্মম্ভরিতার পুরো সুযোগ নিচ্ছে সিপিএম এবং কংগ্রেস জোট। তৃণমূল কংগ্রেসকে না ঘরকা, না ঘাটকা—এই রকম পরিণতিতে নিয়ে যেতে চায় সিপিএম-কংগ্রেস জোট। সিপিএম শত্রু হয়েই শত্রুতা করছে। আর কংগ্রেস মিত্রতার ভান করে শত্রুতা করছে। কংগ্রেসের নানা গোষ্ঠীর কথা সর্বজনবিদিত। সোমেন মিত্ররা আন্তরিক ভাবে তৃণমূলের সঙ্গে জোট চাইলেও, কংগ্রেসের অফিসিয়াল গোষ্ঠী এই জোটের ভান ততদিন করবে যতদিন না তৃণমূল পুরনো জোট সঙ্গীকে পরিত্যাগ করে।

এই রাজ্যে কংগ্রেসের কোনও স্বার্থ দল হিসাবে নাই। প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মানস ভুঁইয়ারা যেকোনও একটা সাধারণ নির্বাচনে নিজেরা জিততে পারলেই খুশী। এই জয়ের জন্য নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় সিপিএম-এর সঙ্গে বোঝাপড়াও হয়। প্রণববাবু একবার এই রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, সিপিএম-এর ভোট নিয়েই। সিপিএম এই নেতাদের বিলক্ষণ চেনে। তাই এদের জেতাতেও সিপিএম-এর আপত্তি থাকে না। ৪২টি লোকসভা আসনের ৪-৫টি কংগ্রেস যদি চায়, ২৯৪টি বিধানসভা আসনের ২৫-৩০ টি যদি চায় — দিয়ে দেওয়া যাবে অর্থাৎ পরোক্ষে জিতিয়ে দেওয়া যাবে। পরিবর্তে রাজ্যের রাজত্ব হাতছাড়া হবে না। সারা ভারতবর্ষে বামফ্রন্ট একটি প্রেসার গ্রুপ। ১০০ বছরেও তারা ক্ষমতায় আসবে না — তাই যে রাজ্যটি হাতে আছে সেটিই রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যা করার একটি রাজনৈতিক দল নিশ্চয় তাই করবে — এটা দোষের নয়। কংগ্রেসও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সরকার গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মতো দু'একটা রাজ্যের কংগ্রেস-কে বলি দিতে দ্বিধা করবে না। এটাও রাজনীতির ব্যাপার।

কংগ্রেস এবং সিপিএম বিলক্ষণ জানে বিজেপি তাদের মূল বিরোধী শক্তি। তাই যেকোনও উপায়ে বিজেপি-কে বাদ দিয়ে মোর্চায় উৎসাহ দেখায়। কংগ্রেস এবং সিপিএম যদি মুসলিম লীগ নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে এবং তা যদি ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা পায় তবে বিজেপি'র সঙ্গে মোর্চায় কী মহাভারত অশুদ্ধ

অরাজনীতির ব্যাপারটা হল এটা না বুঝতে পারা এবং বুঝতে পেরেও মধ্যবর্তী পথ তৈরীর চেষ্টা না করা। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসে'র মধ্যে এই রাজ্যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্যের — যাকে বলা হয় টার্গেট এর। কংগ্রেস রাজ্য সরকার দখলে আগ্রহী নয়, তৃণমূল রাজ্য সরকার দখলে আগ্রহী। তাই আঁতাতটা সেইসব দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে করতে হবে যারা রাজ্যের সরকার দখল করতে চায়। আর তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর জনপ্রিয়তার সুযোগ চাইলেও তাকে কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী করবে না। যদি করে তাহলে বুঝতে হবে সিপিএম ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে অজয় মুখার্জীকে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী করেছিল সেইভাবে। আর সেক্ষেত্রে অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেস যেমন শেষ হয়ে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেসও তেমনি শেষ হয়ে যাবে।

অনেক দল ও গোষ্ঠী নিয়ে আঁতাত হলে কংগ্রেস সে সুযোগ পাবে না। তাই কংগ্রেস শুধু তৃণমূলে'র সঙ্গে আঁতাতেই আগ্রহী এবং তার শর্ত হল তৃণমূলকে বিজেপি'র নেতৃত্বে পরিচালিত এন ডি এ ছাড়তে হবে। তৃণমূল এনডিএ ছাড়ল, কংগ্রেস তাকে সঙ্গ দিল না (যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা কম) এই পরিস্থিতি-না ঘরকা, না ঘাটকা। অবশ্য তৃণমূল এনডিএ-তে আছে আক্ষরিক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। এনডিএ-কে দেখিয়ে কংগ্রেসের নমনীয়তা আদায়ের কূট-কৌশল যা প্রকৃত অর্থে অপকৌশল বা আদৌ কোনও কৌশল নয়। অপরিপক্ক রাজনীতি।

ছুঁৎমার্গ নিয়ে জনবিরোধী কোনও শক্তির বিরুদ্ধে মোর্চা হয় না। জয়প্রকাশজী হাতে নাতে তা দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাসও তাই শেখায়। বিসমার্ক, কাভুর, মাৎসিনী, গ্যারিবল্ডি ছুঁৎমার্গ নিয়ে কাজ করেননি। সুভাষ বোস ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করতেন না। মহান কাজে, বৃহৎ যুদ্ধে, ওই জিনিষ চলে না। ছোট মন নিয়ে বড় কাজ হয় না। বড় কাজে বড় মন লাগে। বরং ছুঁৎমার্গ মেনে কাজ করতে গিয়ে মার্কসবাদ লুপ্ত হয়ে গেছে। আজও তথাকথিত বামমার্গীদের মধ্যে সেই ছুঁৎমার্গ আছে।

কংগ্রেস এবং সিপিএম বিলক্ষণ জানে বিজেপি তাদের মূল বিরোধী শক্তি। তাই যেকোনও উপায়ে বিজেপি-কে বাদ দিয়ে মোর্চায় উৎসাহ দেখায়। কংগ্রেস এবং সিপিএম যদি মুসলিম লীগ নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে এবং তা যদি ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা পায় তবে বিজেপি'র সঙ্গে মোর্চায় কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়?

উচিত হবে জমি রক্ষার আন্দোলনে যারাই কম বেশি ভূমিকা নিয়েছিল তাদের নিয়েই সিপিএম বিরোধী মঞ্চ গঠন করা। বিজেপিও এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক বা আর এস পি কোনওদিনই সিপিএম ছাড়বে না, যতক্ষণ না পরিত্যক্ত হয়। আপাতত পরিত্যক্ত হবে না কৌশলগত কারণে। অতএব পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটা আনুষ্ঠানিক ভাবে বামফ্রন্ট বনাম অবামফ্রন্ট হবে। সিপিএম বিরোধী বললে এই বিরোধী মোর্চার চরিত্রে বিভ্রান্তি আসে। ফ্রন্টভুক্ত ওই তিনটি দল সিপিএম বিরোধী কিছু ভাষণ দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব বজায় রাখতে চায়। কিন্তু নীচুতলার কর্মীরা এইসব দলে, তাদের নেতাদের উপর আস্থা হারিয়েছে। দেনা-পাওনার সম্পর্ক যাদের আছে তারা বাদে বাকীরা এই ফ্রন্ট বিরোধী মোর্চায় অবশ্যই আসবে, যদি এটা ফ্রন্ট বিরোধী বিশেষ করে অবামফ্রন্ট মোর্চা হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারে।

এইক্ষেত্রে পথ হল — কংগ্রেসের যে অংশ আন্তরিকভাবে এই রাজ্যের সরকার পরিবর্তনে আগ্রহী এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ নিয়ে ঝগড়া করবে না — সেই অংশের সঙ্গে বোঝাপড়া। সিপিএম বিরোধী যেকোনও দল ও গোষ্ঠীকে মোর্চার অন্তর্ভুক্ত করা শর্তহীন ভাবে। সরকার দখলের জন্য ২০১১ সালকে বেছে নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করা এবং আন্দোলনের পদ্ধতি পরিবর্তন করা।

আজ এখানে মিছিল, ওখানে অনশন, সেখানে ধর্না, অন্যত্র পথ অবরোধ, অবশেষে জনসভা এবং বন্‌ধ — এসব অস্ত্রে ৮০ বছর ধরে গড়ে ওঠা আর ৩১ বছর ধরে পঞ্চায়েত চালানো সিপিএম-কে তাড়ানো যাবে না — এই কান্ডজ্ঞানটা ভীষণ জরুরী। সুযোগ এসেছিল — কিন্তু রাজ্যব্যাপী সেই সুযোগ রূপায়ণের উপযুক্ত পরিকল্পনা ছিল না। বেশ দৃঢ় ভাবেই বলা যায় যে ২০০৭ সালের প্রথম তিন মাসে সিপিএম ও তার পরিচালিত সরকারকে বেকায়দায় ফেলার যে সুযোগ পাওয়া গেছিল, এখন সে সুযোগ নেই। মাটি চাষের উপযুক্ত হয়েছিল কিন্তু সঠিকভাবে কর্ষণ ও রোপণ হয়নি।

এদেশের চাষীদের মধ্যে একটা কথা চালু আছে — সাত পো, এক জো। অর্থাৎ একটি জো বা সুযোগ, সাত ছেলের সমান মূল্যের। অথবা সাতটি সন্তানকে ত্যাগ করা যায় ১টি জো বা সুযোগকে ত্যাগ করা যায় না। ছেলে গেলে ছেলে জন্মাবে, সুযোগ চলে গেলে সুযোগ আসবে না। সিঙ্গুর আন্দোলনকে সিঙ্গুর থেকে ধর্মতলায় টেনে আনা এবং নন্দীগ্রাম-এর আন্দোলনকে খেজুরী — নন্দীগ্রাম সংঘর্ষে পরিণত করা এ রাজ্যে সিপিএম বিরোধী আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক ভুল।

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের আন্দোলন ছিল — এই সরকার ও তার দলের উপর অনাস্থা ও অবিশ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, যার সঙ্গে প্রতিটি চাষীর স্বার্থ প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল — আর পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও নিম্নবিত্ত মানুষরা। এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। একটি সরকার ও তার দলের উপর রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষের অনাস্থা ও অবিশ্বাস ইতিপূর্বে এরাজ্যে দেখা যায়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রেশন বিক্ষোভ। এটা যে কত বড় শক্তি তা এই আন্দোলনে বৃহৎ শক্তি নিয়ে যে রাজনৈতিক দলটি যুক্ত ছিল — সেই তৃণমূল কংগ্রেস তা বুঝে উঠতে পারেনি। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে এই প্রেক্ষাপট ছিল না। তাই এর যে রূপায়ণ হলে সরকার বিপর্যস্ত হত সে রূপায়ণ হয়নি বরং এখন আন্দোলনকারী সাধারণ রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক মানুষরা দমন-পীড়নে ক্লিষ্ট হচ্ছেন। এতগুলি মৃত্যু ঘটিয়েও মৃত্যুদাতা শাস্তির বাইরে থেকে গেল। নির্ভর করতে হচ্ছে সিবিআই এবং আদালতের উপর— জনগণের উপর নয়।

আজ যদি পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির উত্থান ঘটাতে হয়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত ছেঁদো কথাগুলি বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র বামবিরোধী জোট নাম নিয়ে মোর্চা তৈরি করতে হবে। আন্দোলনকে লাগাতার করতে হবে শুধু তাই নয় — আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। জনসভা, বন্‌ধ, বিক্ষোভ, অবরোধ ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ে না — এগুলির উপর গুরুত্ব কমাতে হবে। সেক্ষেত্রে লাগাতার আইন

আজ যদি পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির উত্থান ঘটাতে হয়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ইত্যাদি বহু ব্যবহৃত ছেঁদো কথাগুলি বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র বামবিরোধী জোট নাম নিয়ে মোর্চা তৈরি করতে হবে।

অমান্যর পথই একমাত্র পথ — কোচবিহার থেকে দীঘা, পুরুলিয়া থেকে সাগরদ্বীপ। যে দলের যেখানে বেশি শক্তি সেই দলই সেখানে নেতৃত্ব দিক। স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি হোক। কেন্দ্রীয়ভাবে সব দল ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হোক — যে কমিটি নীতি নির্দ্ধারণ করবে ও যৌথ নেতৃত্ব দেবে। একক নেতৃত্বে আন্দোলনের যুগ শেষ হয়ে গেছে। মনস্তাত্বিক ভাবে সকলেই নিজ নিজ এলাকায় গুরুত্ব পেতে চায়। এবং তা দেওয়া ও মেনে নেওয়াই ব্যাপক মোর্চার প্রাণ ভোমরা।

যেহেতু ব্যাপক গণ আন্দোলন ব্যতিরকে এই দল ও সরকারকে হটানো যাবে না, সেহেতু ব্যাপক গণ আন্দোলনের পথই একমাত্র পথ এবং এই পথে শর্তহীন ভাবে সকলকে যুক্ত করতে হবে। ছুঁৎমার্গ মানসিকতা গণ আন্দোলন বিরোধী মানসিকতা যেকোনও মূল্যে পরিহার করতে হবে।

মণিপুরে শিক্ষিত বেকার ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার

সংবাদদাতা ।। মণিপুরে বিভিন্ন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে শিক্ষিত বেকারদের নাম নথিভুক্তকরণ অব্যাহত। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, মণিপুরে এ পর্যন্ত ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশ একান্ন জন শিক্ষিত বেকার নাম নথিভুক্ত করেছে। এর মধ্যে শিক্ষিত মহিলা বেকারের সংখ্যা এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছয়শ পঁয়তাল্লিশ।

এ বছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যের নয়টি জেলায় কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নিবন্ধীকৃত সংখ্যা এই। মণিপুরের জনসংখ্যা প্রায় তেইশ লক্ষ। এই হিসেব থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখানে প্রায় প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন বেকার।

পঞ্চ পাণ্ডবের যুগাবসান

শূন্যতার আঁধারে ভারতীয় ক্রিকেট

শচীন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। সুনীল গাভাসকার, কপিল দেব, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ও মহিন্দার অমরনাথকে ঘিরেও গড়ে উঠেছিল এরকমই এক ফ্যাব ফোর। এখন যেমন শচীন, সৌরভ, রাহুল, লক্ষ্মণ ও কুম্বলেকে নিয়ে বহু চর্চিত ফ্যাব ফাইভ। তবে তৎকালীন ফ্যাব ফোরের অবসর গ্রহণে সেরকম শূন্যতা অনুভব হয়নি। যদিও কালপ্রবাহের নিরিখে এরা কেউই সমসাময়িক নয়। মাঝে কয়েকটা বছর একসঙ্গে জাতীয় দলে খেলেছেন। উল্টো দিকে বর্তমানের ফ্যাব ফাইভ প্রায় সমসাময়িক। শচীন ও কুম্বলে কয়েক বছর আগে শুরু করলেও দীর্ঘ বারো-তেরো বছর সৌরভ, রাহুল ও লক্ষ্মণের সঙ্গে ড্রেসিংরুম থেকে হোটেল-সর্বত্র একসঙ্গে থেকেছেন। তাই এদের বিদায় ঘন্টা একই সঙ্গে একই সুরে বাজতে চলেছে।

অতীতের ফ্যাব ফোরের অবসর তেমন শূন্যতা সৃষ্টি করেনি। বস্তুত বেদী ও গাভাসকারের হাত ধরেই ভারতীয় ক্রিকেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে। তার আগে ব্যক্তিগত দক্ষতার নিরিখে কতিপয় ভারতীয় ক্রিকেটার টেস্ট ক্রিকেটে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেলে ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু দল হিসেবে ভারত

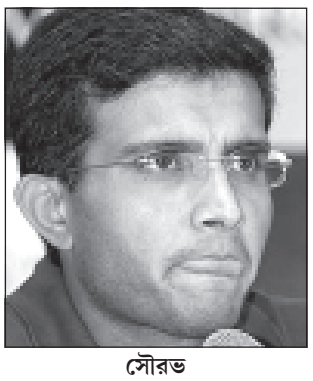

সৌরভ

কখনই টেস্ট বিশ্বের সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পারেনি। বিদেশে খেলতে গিয়ে ভরাডুবি হয়ে সিরিজ ও মান সম্মান খুইয়ে ফিরে আসা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাইগার পতৌদির আমলে খানিকটা হলেও লড়াই দিতে পেরেছিল ভারতীয় দল বিদেশের মাঠে। তারপর অজিত ওয়াদেকারের হাতে পড়ে আমূল বদলে যায় ভারতীয় ক্রিকেট। ৭১-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডে পরপর সিরিজ জয় ক্রিকেট দুনিয়াকে বাধ্য করে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে মনোভাব পাল্টাতে।

তারপর বেদীর নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করে এক আদ্যন্ত লড়াকু ভারতীয় ক্রিকেট। গাভাসকার, বিশ্বনাথ, মহিন্দারের ব্যাটসম্যানশিপ ও বেদী, চন্দ্রশেখর, ভেঙ্কটরাঘবন, প্রসন্নর স্পিন চতুর্ভুজ দেশের মাটিতে বেশ কয়েকটি সিরিজ জেতায় বিদেশেও যথেষ্ট ভাল পারফরমেন্স দেখায় ভারতীয়রা। আর পরবর্তীতে গাভাসকারের নেতৃত্বে আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় ভারত। এ সময়েই উঠে আসে কপিল দেব। যার অলরাউণ্ড দক্ষতা ও হার না মানা এক সংকল্পবদ্ধ ও লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট দলে রূপান্তরিত করে ভারতীয় ক্রিকেটকে। যার ফলশ্রুতি ৮৩-র বিশ্বকাপ ও ৮৫-র 'বেনসন

কুম্বলে

অ্যাণ্ড হেজেস' মিনি বিশ্বকাপ জয়। এই দুই অসাধারণ সাফল্যই টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায় এদেশীয় ক্রিকেটে।

তারপর থেকেই ভারতের সর্বত্র ক্রিকেট তার শাখা প্রশাখা মেলে ধরে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো নাক উঁচু দলগুলি যারা এতদিন ভারতকে খাটো করে দেখে এসেছে, তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে ভারতের সঙ্গে সিরিজ খেলতে। তার একটা বড় কারণ ৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ের পরপরই ভারতের বেশ কয়েকটা বড় শিল্প বাণিজ্য সংস্থা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে, ক্রিকেটকে সেলেবল্ কমোডিটি হিসেবে বাজারে উপস্থাপিত করে। ক্রমশ ধনী হয়ে ওঠে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তাই ভারতে খেলতে এলে মিডিয়া প্রচার ও বাণিজ্যিক মুনাফা দুইই পাওয়া যাবে — এই আশায় এদেশে খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করে অন্যান্য দেশ। বোর্ডও তাদের অভিসন্ধি বুঝে পড়ার পর সিরিজ অনুমোদন করে যায়। খেলা ও খেলোয়াড় উভয় পক্ষেই আর্থিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে কুলীন গোত্রে ঢুকে পড়ে এবং অন্যান্য খেলাগুলির গুরুত্ব কমতে থাকে। আর নয়ের দশক থেকে তো এদেশের মানুষ খেলা বলতে শুধু ক্রিকেটকেই বোঝে।

দ্রাবিড়

মানসিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। নাম, যশ, অর্থ দুহাতে কামাতে থাকেন খেলোয়াড়রাও। এত খেলার মধ্যেও যে শচীন, কুম্বলেরা প্রায় দুটো দশক দেশকে টেনে নিয়ে গেছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণরাও বারো-তেরো বছর খেলে গেলেন। এই পাঁচজন ভারতীয় ক্রিকেটকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, তার রেশ ও প্রভাব থেকে যাবে আগামী কয়েকটা বছর। গাভাসকার, কপিলরাও দেশকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় সাফল্য ৮৩-র বিশ্বকাপ জয়। একমাত্র বিশ্বকাপটিই অধরা থেকে গেছে বর্তমান 'ফ্যাব ফাইভের'। এটা বাদ দিলে কী একদিনের ম্যাচ কী টেস্ট

ক্রিকেট — দু'ধরনের ক্রিকেটেই ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে এই দশকে। সবচেয়ে বড় কথা যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে সব দল জমি নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই অস্ট্রেলিয়াকে সবচেয়ে বেশি বেগ দিয়েছে সৌরভের নেতৃত্বাধীন ভারত।

এই প্রসঙ্গে সৌরভের কথাও শুনতে হয়। পূর্বসূরী সব অধিনায়কের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র ও মানসিকতার অধিকারী সৌরভ। যে বাঙালিকে টেস্ট ক্রিকেটে অনুপযুক্ত বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে বাকি ভারত — সেই বাঙালি সৌরভই কিনা ভারতীয় ক্রিকেটকে রত্নগর্ভা করে তুলেছেন। দেশে-বিদেশে বছরে ১০-১৫টি টেস্ট ও ৩০-৪০ টি করে ওয়ান-ডে ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়রাও বোর্ডের ভোগবাদী

লক্ষ্মণ

বহু প্রতিভাবান বাঙালি যারা কিনা জাতীয় দলে ঢুকতে পারেননি অবিচার ও বঞ্চনার শিকার হয়ে, তাদের সবার চোখের জল মুছে দিয়েছেন সৌরভ। দু'ধরনের ক্রিকেটেই সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পারফর্ম করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তলিয়ে যেতে বসা ভারতীয় ক্রিকেটকে টেনে তুলে একের পর এক গৌরব শৃঙ্গে বসিয়েছেন। আজহারউদ্দিনের সময় বেটিং কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত ভারতীয় ক্রিকেট যেকোনও মুহূর্তে মাটির তলায় চাপা পড়তে পারতো। চারিদিকে হতাশা হাহাকার, সন্দেহ, অবিশ্বাসের বাতাবরণ। 'টিম স্পিরিট' বলে কিছু নেই। সিনিয়র জুনিয়ারে মনোমালিন্য চলছে। সেই অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে ভারতীয় ক্রিকেটের নব রূপান্তর ঘটালেন- ক্যাপ্টেন সৌরভ এবং দু'বছরের মধ্যেই বিশ্ব ক্রিকেটে এক শক্তিশালী দল হয়ে উঠল ভারত। তাই সৌরভ সহ ফ্যাব ফোরের আসন্ন বিদায় সব অর্থেই ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি করবে ভারতীয় ক্রিকেটে। যে শূন্যতা গাভাসকার, কপিলদেবের বিদায়ের পর তেমন বোঝা যায়নি, তাদের বিদায়ের দু-তিন বছরের মধ্যেই শচীন, কুম্বলে, সৌরভ, রাহুলরা এসে পড়ায় কোনও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি ভারতীয় ক্রিকেটকে। তাই সৌরভের দেখানো পথ ধরে কুম্বলেও ঢুকে পড়লেন অবসর সরণিতে। শচীন, লক্ষ্মণ, রাহুলও হয়ত এক বছরের মধ্যেই সরে যাবেন। এদের জায়গা ভরাট করার মতো প্রতিভা কী আছে এদেশে। রোহিত শর্মা, সুরেশ রায়না, বদ্রীনাথ বা যুব বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিরা ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতির ছাপ রেখেছেন।

সব ধরনের ক্রিকেটেই মোটামুটি সাফল্যের যতিচিহ্ন আঁকতে পেরেছেন। তবে বিদেশের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শক্তিশালী বোলিং অ্যাটাককে কীভাবে সামাল দেবেন তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে ভারতীয় ক্রিকেট শেষ হয়ে যাবে না। কারণ সহবাগ, গম্ভীর, হরভজন, ধোনির মতো পোড় খাওয়া সফল ক্রিকেটার এখনও বেশ কয়েক বছর খেলবেন।

শব্দরূপ - ৪৮৬

কণিকা মজুমদার

১	২			৩	■	■	৪
■		■	■		■	■	
■		■	■	৫	৬		
৭		৮	■	■		■	■
■	■		■	■	৯	১০	
১১			১২	■	■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	১৩				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. গোপনীয় আলাপ, হাস্য পরিহাস যুক্ত কথাবর্তা, ৩. একসঙ্গে যাওয়া, ৭. বাঁশের ফালি বা চট, ৯. ইন্দ্র কর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ, ১১. দুই জনের মধ্যে কথাবার্তা বা আলাপ, ১৩. অতি নীচ বা ঘৃণিত প্রকৃতির মানুষ।

উপর-নীচ ঃ ২. করতলের ভাগ্য নির্দেশক রেখা, ৩. তৎসম শব্দে কাঁঠাল, ৪. তিনটি নয়ন বলে দুর্গা ও কালীকে এই নামেও ডাকা হয়, ৬. হোম-যজ্ঞ করতে হবে তৎসম শব্দে, ৮. আরবি শব্দে অশ্বারোহী সৈন্যদল, ১০. বিশেষণে স্ত্রী অর্থে আলুলায়িত কেশযুক্তা, চুলখোলা অবস্থায় রয়েছে এমন, ১১. রামায়ণ রচয়িতা, ১২. অধ্যয়ন।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৪

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

দ্রা	■	না	ম	তা	■	নে	■
ঘি	■	কা	■	মা	ল	শা	■
মা	র্ব	ল	■	শা	■	খো	■
ং	■	■	■	■	স	র	লা
শ	রি	কি	■	■	■	■	ই
■	নি	■	শি	■	হ	র	ফ
■	ঝি	নু	ক	■	রি	■	বো
■	নি	■	ল	ব	ণ	■	ট

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শ্রীলঙ্কা সরকার

রাজপক্ষে ঘোষণা করেছেন, 'প্রভাকরণকে না ধরা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।' তবে শ্রীলঙ্কা সরকারকেও তামিলদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট আন্তরিক হতে হবে। সিংহলীদের সমান ক্ষমতা প্রদান করতে হবে অধিবাসী তামিলদের। নচেৎ শান্তি সুদূরপরাহত।

অর্ণব নাগ।। জোর লড়াই বেঁধেছে শ্রীলঙ্কা সরকারের সঙ্গে তামিল জঙ্গি সংগঠন লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এল টি টি ই)-এর। আর এই যুদ্ধে এখনও অবধি বলা যায় বেশ কিছুটা বেকায়দায় রয়েছে এল টি টি ই। বিশেষ করে সে দেশের পূর্বাঞ্চল ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়েছে টাইগারদের এবং পশ্চিম মান্নার উপকূলেও তাদের প্রভাব ক্রমশ কমছে। এখন এল টি টি ইর সদর দপ্তর কিলিনোচ্চির প্রায় দরজায় এসে কড়া নাড়ছে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী। একইসঙ্গে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজপক্ষের বক্তব্য, অপর তামিল জঙ্গি ঘাঁটি মুল্লাইথিভু দখলের লক্ষ্যে পূর্বদিক দিয়েও এগোচ্ছে সেনারা। এই মুল্লাইথিভু একটি বড় বন্দর শহর ও তামিল টাইগারদের নৌবাহিনীর ঘাঁটি। এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো এল টি টি ই-র দুই সেনানায়ক দল ছেড়ে সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এঁরা হলেন ভি মুরলীধরন ওরফে করুণা এবং এস শান্তিরকান্তন ওরফে পিলায়ন। এঁদের মধ্যে পিলায়ন এখন পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী এবং করুণা শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের সদস্য। এই দু'জনকে খুব সুকৌশলে এল টি টি ই-র বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন রাজপক্ষে। তাঁর নিজের ভাষায় পিলায়নকে মুখ্যমন্ত্রী করতে প্রভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়েছিল তাঁকে। ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছেন তামিল টাইগারদের রাজনৈতিক প্রধান তামিলসেলভন। তাই সব মিলিয়ে স্বস্তিতে নেই এল টি টি ই সুপ্রিমো প্রভাকরণ। নিজের ধরা পড়ার আতঙ্ক তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বলে সেনাবাহিনী সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

প্রভাকরণ

লড়াই-এ ফিরে আসার মরিয়া প্রচেষ্টা করছে টাইগাররা। তাদের ঘাঁটি উত্তরের কিলিনোচ্চি ও মুল্লাইথিভুতে প্রতি আক্রমণের পথে হাঁটছে তারা। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর উপর বিমানহানা সংগঠিত করে তারা ইতিমধ্যেই সরকারকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, তারা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।

তবে এতসবের মধ্যেও লড়াই-এ ফিরে আসার মরিয়া প্রচেষ্টা করছে টাইগাররা। তাদের ঘাঁটি উত্তরের কিলিনোচ্চি ও মুল্লাইথিভুতে প্রতি আক্রমণের পথে হাঁটছে তারা। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোর উপর বিমানহানা সংগঠিত করে তারা ইতিমধ্যেই সরকারকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে, তারা এখনও ফুরিয়ে যায়নি। গত ২৮ অক্টোবর র‍্যাডারের নজর এড়িয়ে টাইগারদের একটি এয়ারক্র্যাফট্ কলম্বোর ওপর দুটি বোমা ফেলে। যার দরুণ এক ঘন্টা ব্যাপী ব্ল্যাক আউটের শিকার হয় রাজধানী কলম্বো। সরকারকে ভড়কে দিতে এল টি টি ই দাবি করছে— তাদের দুটি মাঝারি পাল্লার এয়ার ক্র্যাফট্ আগামী দিনে অবিশ্বাস্য মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা যোগাবে।

কিন্তু সামগ্রিক শক্তির বিচারে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে এল টি টি ই। যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত ডিভিশনের হিসাবে শ্রীলঙ্কার সৈন্যসংখ্যা যেখানে ৩০,০০০ সেখানে টাইগারদের শক্ত ঘাঁটি পূর্বাঞ্চল খোয়ানোর পর, তাদের সৈন্যসংখ্যা ৫০০০-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কের সংখ্যা ২০০, সেখানে টাইগারদের একটিও ট্যাঙ্ক নেই। আর্টিলারি গান সেনাবাহিনীর আছে ৪০০টি, টাইগারদের ৬০টি। সেনাবাহিনীর যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা ৬০টি, এল টি টি ই-র ৩টি। ফাস্ট অ্যাটাক নৌবহর সেনাবাহিনীর আছে ৪০ টি, সেখানে টাইগারদের আছে মাত্র ৩টি। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে সহজেই অনুমেয় এল টি টি ই-র শক্তি শ্রীলঙ্কা-র সেনাবাহিনীর তুলনায় বেশ কম। তবু যুদ্ধে ফিরে আসার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছেন না এল টি টি ই-র সুপ্রিমো প্রভাকরণ। সেনাবাহিনীর অনুমান তিনি মুল্লাইথিভুর কাছে পুথুক্কুদিয়িরুপ্পুর জঙ্গলেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছেন। আর এ কাজে তিনি ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছেন দু'লক্ষ তামিল উদ্বাস্তুদের। আবহাওয়ার প্রতিকূলতা শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর বিজয় রথকে কিছুটা হলেও থমকে দিয়েছে। কারণ উত্তরাঞ্চলে ফিরতি মৌসুমী বায়ুর প্রকোপ শুরু হওয়ায় শ্রীলঙ্কা সেনাবাহিনী যুদ্ধের গতি কিছুটা শ্লথ করে দিয়েছে। টাইগার বাহিনীর মূল ঘাঁটি কিলিনোচ্চি দখল করতে গেলে পেরোতেই হবে ওয়ান্নির জঙ্গল। প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক রাজ চেঙ্গাপ্পা একটি মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন এই জঙ্গলের। তাঁর বর্ণনায় — নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত জঙ্গলটিতে গাছের উচ্চতা বেশির ভাগ স্থানে ৬০ ফুটের ওপরে। মাথার ওপর পাতার আস্তরণ এতই পুরু যে তা ভেদ করে সূর্যের আলো প্রবেশ করা রীতিমতো দুরুহ ব্যাপার। ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত কারণেই এই জঙ্গল ক্রমশ দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে উঠেছে এল টি টি ই-র। যখনই কোনও বড় ধরনের আক্রমণ হয়, তখনই বহুরূপীর ধাঁচে গহন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা। আবার সেনাবাহিনীকে বিপাকে ফেলতে এই জঙ্গলেই পাতে মরণফাঁদ।

তবে এবার আটঘাঁট বেঁধেই টাইগারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে শ্রীলঙ্কা সরকার। সেনাবাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার দক্ষিণ পেরেরার ব্যাখ্যায় সেনাঘাঁটি অনুরাধাপুরা থেকে যুদ্ধ স্থল পর্যন্ত যুদ্ধ বিমানগুলি গাছের মাথা ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে। যার জন্য দেখে শুনে তাক করে গুলি করার মতো যথেষ্ট সময় পাচ্ছে না টাইগাররা। এছাড়া এই যুদ্ধে যে ডিভিশনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী সেই ৫৭ নং ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জগৎ ডায়াসকে। এই ডায়াসের বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে টাইগারদের সঙ্গে লড়াই এর। ডায়াস থাকার সবেচেয়ে বড় সুবিধে এই — যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে এল টি টি ই সিদ্ধহস্ত সেই গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করতে অন্ততঃ সম্মুখ সমরের তুলনায় তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১০,০০০ সশস্ত্র সেনা রওনা দিয়েছে কিলিনোচ্চির দিকে। ৫৭ ডিভিশন ইতিমধ্যেই কিলিনোচ্চির আক্কারাইয়াং-কুলেমা অঞ্চলের উত্তরে প্রতি-আক্রমণ চালানোয় যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে টাইগারদের। এর সাথে সাথে ওই ডিভিশন শত্রু আক্রমণের টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছে আক্কারাইয়াং কুলেমার পূর্বের হেরামুড়িকান্ডি অঞ্চলকে।

শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী

সাগরপারের যুদ্ধের আঁচ এসে পৌঁছেছে এদেশেও। এ আই এ ডি এম কে নেত্রী জয়ললিতা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তামিলনাড়ু থেকে প্রতিনিয়ত পেট্রল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি স্মাগলিং করে নিয়ে যাচ্ছে এল টি টি ই। তিনি বলেছেন, "ফান্ড ও রিলিফ মেটিরিয়েলস কখনই শ্রীলঙ্কার তামিলদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। জনগণ আতঙ্কিত। এতে শ্রীলঙ্কার তামিলদের সমস্যা আরও বাড়বে।" এদিকে শ্রীলঙ্কা সরকারকে যুদ্ধ থামাবার জন্য ভারত সরকারকে চাপ দেওয়ার কথা বলে কেন্দ্রকে একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সুবিধাবাদিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম বলেছেন, এল টি টি ই-র উগ্রপন্থী কার্যকলাপ শ্রীলঙ্কার তামিলদের কোনওমতেই সাহায্য করছে না। তিনি একইসাথে এও বলেছেন যাঁরা বিপজ্জনক কথা বলে তামিলনাড়ুর তামিলদের খেপিয়ে দিচ্ছেন, রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। মুখে যাই বলুন, ইউ পি এ সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং খুব ভাল করেই জানেন যে সরকারের শরিক ডি এম কে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে গেলেও শুধুমাত্র সরকার টেকানোর স্বার্থে তা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। ভাবতে অবাক লাগলেও একথা সত্যি একদা দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী প্রাণ হারিয়েছিলেন তামিল টাইগারদের হাতে। আর এখন তাঁর সহধর্মিণী এল টি টি ই-র মদতদাতা করুণানিধির হাত ধরে সরকারের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

রাজপক্ষে

প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৭ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কা আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর এবং ১৯৯০ সালে আই পি কে এফ (শান্তিবাহিনী) সরে আসার পরে শ্রীলঙ্কার সিংহলী তামিল সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি ভারত। কিন্তু বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতি এক অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ সারা বিশ্বের কাছেই জ্বলন্ত সমস্যা। যে সমস্যাকে ঘিরে নিজেদের আখের গুছোতে ব্যস্ত এল টি টি ই এবং করুণানিধির মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। আর এদের ক্রমাগত মদত যুগিয়ে চলছে পাকিস্তান ও চীনের মতো দুটি বিচ্ছিন্নতাকামী রাষ্ট্র। রাজপক্ষে ঘোষণা করেছেন, 'প্রভাকরণকে না ধরা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।' তবে শ্রীলঙ্কা সরকারকেও তামিলদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট আন্তরিক হতে হবে। সিংহলীদের সমান ক্ষমতা প্রদান করতে হবে অধিবাসী তামিলদের। নচেৎ শান্তি সুদূরপরাহত।

Swastika
17 November - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণ বরদাস্ত করা হবে না

কলকাতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বক্তব্য রাখছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। হাজার বছর ধরে নিদ্রিত অসংগঠিত হিন্দুসমাজ এখন জেগেছে। এখন আর তারা অত্যাচার সহ্য করবে না। সেবার নাম করে খৃস্টান মিশনারীদের জনজাতি, বনবাসী, গিরিবাসী তথা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ আর বরদাস্ত করা হবে না। স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর মতো উদার, সহজ সরল সন্ন্যাসী সমাজসেবকের হত্যাকাণ্ড মুখ বুজে সহ্য করা হবে না। এসব অন্যায়ের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য হিন্দুসমাজ আজ প্রস্তুত। গত ৭ নভেম্বর কলকাতায় রাণী রাসমণি রোডে 'স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতি-র ব্যানারে আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় এই কথাগুলি বলেন সভার অন্যতম বক্তা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, খৃস্টান মিশনারীদের প্রেরিত ও চার্চের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এন এল এফ টি জঙ্গিরা গত ১৯৯৯ সালে ত্রিপুরার কাঞ্চনছড়াতে জনজাতি ছাত্রাবাস পরিদর্শনরত চারজন প্রমুখ সঙ্ঘ কার্যকর্তাকে বন্দুকের মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এঘটনা সবার জানা। সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের পথে খৃস্টান মিশনারীদের কাছে ওড়িশার জনজাতি প্রধান জেলা কন্ধমালে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী বিশাল বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলেই চার্চের মদত পুষ্ট জঙ্গি সন্ত্রাসীরা জন্মাষ্টমীর রাতে স্বামীজী ও তাঁর শিষ্য-শিষ্যাসহ চারজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে জনজাতি সমাজ হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, যার বহিঃপ্রকাশ কন্ধমালে দেখা গেছে। সংগঠিত হিন্দু সমাজ জম্মুতে আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকার প্রদত্ত জমি আবারও শ্রাইন বোর্ডকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। বিদেশে চার্চ বিক্রি হচ্ছে, খৃস্টানরা হিন্দু হয়ে হরিনাম করছে। সেখানে যাক মিশনারীরা, ভারতে দরকার নেই।

সভার অপর বক্তা বিশিষ্ট লেখক ও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক তথাগত রায় বলেন, খৃস্টান মিশনারীরা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের পঞ্চম বাহিনী যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে দেখা গেছে। শ্রীরায় বলেন, আমিও কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি, বাইবেল পড়েছি। বাইবেলে প্রভু যীশুর অনুগামীদের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা রয়েছে। আর সেটাই করছে খৃস্টান মিশনারীরা। তবে এদিন শ্রীরায় ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনীতিক ও তাদের প্রচারক একশ্রেণীর সেক্যুলার মিডিয়াকে একহাত নেন। তিনি বলেন, বেশির ভাগ মিডিয়া একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে। তারা প্রথম পাতায় ছবি সহ বার বার রিজওয়ানুরের খবর বের করলেও মুর্শিদাবাদের লক্ষ্মণপুর গ্রামের হিন্দু যুবক শৈলেন্দ্র প্রসাদকে মুসলিম মেয়ে বিয়ে করার জন্য কাজীর বিচারে গলা কেটে হত্যা করার কথা আদৌও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেনি। মিডিয়ার বাড়াবাড়ির জন্যই আজ প্রিয়াঙ্কা টোডির বাবার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছে। তাঁর অপরাধ তিনি মেয়েকে মুসলমানকে বিয়ে করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছিলেন। রিজওয়ানুরের আত্মহত্যা দুঃখজনক। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা টোডির বাবা যা করেছেন তা যে কোনও হিন্দু মেয়ের বাবার পক্ষে স্বাভাবিক। তবে এই একপেশে সংবাদ পরিবেশনের জন্য একদিন এই মিডিয়াকেও মানুষ উপযুক্ত জবাব দেবে।

সভার প্রথম বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, চার্চের মদতপুষ্ট দুস্কৃতীরা স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীকে হত্যা করেছে। ওড়িশা সরকারও এজন্য সমানভাবে দায়ী। আগেও আটবার স্বামীজীর উপর দৈহিক আক্রমণ হয়েছিল। সরকার সব জানা সত্ত্বেও ব্যবস্থা নেয়নি। স্বামীজী ওড়িশার ওই জনজাতি প্রধান জেলায় জনজাতিদের জন্য স্কুল, ছাত্রাবাস, কন্যা ছাত্রাবাস, আশ্রম, মন্দির করে শুধু ধর্মান্তরকেই রুখে দেননি, উপরন্তু যাঁদেরকে বছরের পর বছর ছলে বলে কৌশলে প্রলোভনে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল তাদেরকেও পূর্বপুরুষের হিন্দু ধর্মে পরাবর্তন করে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সে সংখ্যাটাও লক্ষাধিক। এটা সহ্য করা চার্চের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ওড়িশায় ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ আইন (Special Act) থাকলেও আদালতে লিপিবদ্ধ করা হত না। সেখানে সরকারি পরিসংখ্যানে মাত্র কয়েকজনেরই খৃস্টমতে গ্রহণ করার কথা হয়েছে। শ্রী চ্যাটার্জী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন খৃস্টান মিশনারীরা যা অপরাধ করেছে সারা ভারত মহাসাগরের কাদা তাদের ছুঁড়ে মারলেও তা অনেক কম হবে। সভার মাঝেই রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালকে স্মারক লিপি দিতে যান। স্মারক লিপিতে ধৃত নির্দোষ হিন্দুদের মুক্তি ও লক্ষ্মণানন্দজীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করে রাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলা কেন্দ্রে এদিন (৭ নভেম্বর, ০৮) একসঙ্গে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী শ্রদ্ধাঞ্জলি সমিতির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও স্মারকলিপি দেওয়ার অনুষ্ঠান হয়েছে। আগামী ১৫ নভেম্বর ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরেও সারাদিন ব্যাপী ধর্না ও বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। রাসমণি রোডের সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিজেপি নেতা মলয় মজুমদার, প্রভাকর তেওয়ারি ও চঞ্চল দাস প্রমুখ।

কলকাতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় উপস্থিত দর্শক -শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

উত্তরবঙ্গে ঘাঁটি গাড়ছে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন

মহাবীর প্রসাদ টোডী ।। লস্কর-ই-তোইবার মদতে উত্তরবঙ্গেও ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি সংগঠন দ্রুত সক্রিয় হচ্ছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রকাশ যে, নিম্ন অসমে ঘাঁটি গেড়ে এই সংগঠনগুলি এতদিন কাজ করছিল। এবার উত্তরবঙ্গেও তারা কাজ শুরু করেছে বলে গোয়েন্দা দপ্তর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে সতর্ক করেছে। এই চাঞ্চল্যকর তথ্যে জেলায় পুলিশ প্রশাসনের রীতিমতো ঘুম ছুটেছে।

কুন্দনলাল টামটা, আই জি উঃ বঃ

পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরেছে যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর, চোপড়া, রামগঞ্জ, দাসপাড়া এলাকায় এদের সদস্যরা সক্রিয়। লস্কর-ই-তোইবা পিছন থেকে মদত দিলেও সিমি স্থানীয়ভাবে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনকে সাহায্য করছে। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের প্রথম সারির কয়েকজন নেতা এই এলাকায় গোপনে মিটিং করে গিয়েছে বলে প্রকাশ। রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের আই জি কুন্দনলাল টামটা বলেন, ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো সংগঠন উত্তরবঙ্গে সক্রিয় হচ্ছে বলে খবর মিলেছে। গোপনে তারা মিটিং করেছে। সিমি'র সঙ্গে মিলে তারা ওই কাজ করছে। আমরা সতর্ক আছি। দু'জন প্রথম সারির নেতার নাম পাওয়া গিয়েছে। তাদের খোঁজও চলছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, সিমি ও ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন মিলে "শাহিন ফোর্স" নামে অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরি করেছে যার কমান্ডার হলেন আবদুল গণি। তার বাড়ি চোপড়ার কাঁচাকালি গ্রামে। পুলিশ জানতে পেরেছে দিল্লীতে বিস্ফোরণের সময় আবদুল সেখানেই ছিল। সেখান থেকে সে চোপড়ায় পালিয়ে আসে। দিল্লীতে বিস্ফোরণের ঘটনার পরেই ইসলামপুর মহকুমার চোপড়ায় আজাদ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে প্রায় দু'ঘন্টা গোপন বৈঠক হয়। গোয়েন্দা সূত্রে এ খবরও আছে যে, ওই বৈঠকে রামগঞ্জের বাসিন্দা তথা সিমি'র উত্তর দিনাজপুরের সভাপতি মইনুদ্দিন আশরফি, চোপড়ার খোঁচাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা তথা সিমির দক্ষিণ দিনাজপুর'এর সম্পাদক কলিমুদ্দিন আশরফি, দাসপাড়ার বাসিন্দা তথা সিমির অ্যাকশন স্কোয়াডের সদস্য শাহিদ রাজা সহ কয়েকজন সক্রিয় সদস্য ছিল। দীর্ঘক্ষণের গোপন বৈঠকে দিল্লী বিস্ফোরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে আবদুল। ওই সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তরের এক পদস্থ অফিসার বলেন, ওই বৈঠকে স্থানীয় কমবয়সী যুবকদের সংগঠনে টানা সহ বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শাহিন ফোর্সকে। সিমির সভাপতিকেই ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আবদুল গণি যুবক সংগ্রহের জন্য তাদের কে এল ও সহ বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে কাজ করার নির্দেশ দেয়। আই জি বলেন যে, বস্তি এলাকাগুলিতে ছদ্মবেশে এই ধরনের সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিচ্ছে বলে খবর মিলছে। বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করা হয়েছে বলে প্রকাশ।

এদিকে পুলিশের একাংশ একথাও স্বীকার করেছে যে, বস্তি এলাকাগুলিতে পুলিশের সেভাবে নজরদারি না থাকায় সেখানেই সংগঠনের সদস্যরা আশ্রয় নিচ্ছে। আর বস্তি এলাকাগুলিতে কারা বাইরে থেকে এসে থাকছে সেই ব্যাপারে কোনও তথ্যই পুলিশের কাছে না থাকার কারণে জঙ্গিরা ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে সক্রিয় হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর, চোপড়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্ত এলাকায় এসব জঙ্গিরা আশ্রয় নিচ্ছে বলে খবর রয়েছে।

অন্যদিকে গোপন সূত্রে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে যে, এসব জঙ্গিরা কলকাতা সহ উত্তরবঙ্গে বড় ধরনের নাশকতার ছক কষছে। এদিকে ওয়াকিবহাল মহল থেকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, যদিও এখন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ সহ গোটারাজ্যেই সন্ত্রাস থাবা বসায়নি, কিন্তু বোমা এসে পৌঁছেছে রাজ্যের উঠোনে। তাই বিশেষ সতর্কতা জরুরী, নইলে যে কোনও সময় বড় ধরনের নাশকতার কাণ্ড জঙ্গিরা ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করছে এই মহল।

জেলায় সাংবাদিক চাই

সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য জেলায় সাংবাদিক চাই। বাংলায় লিখতে জানা, ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের স্নাতক প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। প্রার্থীকে অবশ্যই সেই জেলায় বসবাস করতে হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ মধ্যে আবেদন পাঠাতে হবে — সাংবাদিক চাই। c/o স্বস্তিকা। ২৭/১ বি, বিধান সরণি। কলকাতা-৬

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com